অস্তাচল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উপহার

শ্রী

ার মা

পরমারাধ্যা স্বর্গীয়া হেমবরণী দেবীর

পবিত্র স্মৃতিতর্পণে—

অস্তাচল যখন ভারতবর্ষে ছাপানো হ'চ্ছিল, তখন আমার প্রিয় বন্ধু পরলোকগত প্রভঞ্জনকুমার রায়—রোগ-শয্যায়। অস্তাচলের শেষ দেখে যাওয়ার জন্যে তাঁর যে গভীর আগ্রহ ছিল, আজ আমার মধ্যে আক্ষেপের রূপ নিয়ে, তাই অস্তাচলের বুকে আঁকা রইল।

অস্তাচল

চৈত্রের দুরন্ত সূর্য্য দিনের শেষে ক্লান্ত দেহে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ কোলে ঘুমাইয়া পড়িল।

* * * *

"তা কি কোনো রকমেই হ'তে পারে না মিস্?"

"না"।

প্রসঙ্গটা চাপা দিবার উদ্দেশে তরুণী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"ঐ দেখুন; অনেকদিন বিলেতে থেকে, সেখানকার চাল-চলন আপনার এতই মজ্জাগত হ'য়ে গেছে যে, বাঙালীকে—নিজের জাত-ভাইকেও আর দেশী কায়দায় বনিয়ে নিয়ে চ'ল্‌তে পারেন না। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এগুলো কি বিলেত-ফেরত মাত্রেরই রোগ? আমি কিন্তু ঐ সব সাহেবিয়ানা খুব অপছন্দ করি। ওতে তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তিই আসে বেশী। যাক্, আপনি আমায় মিস্ না ব'লে, নাম ধ'রেই ডাকবেন। আমার সঙ্গে ওগুলো ঠিক খাপ খায় না।"

"আচ্ছা, তাই ক'র্‌বো এবার হ'তে। বিলিতি কায়দা যে মজ্জাগত হ'য়ে গেছে ব'লেই সেই ধাঁচে সব সময় চ'ল্‌তে চাই, তা ঠিক নয়। ওতে অনেক অসুবিধার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। নাম না জানার ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না; কোন আদবেরও বালাই নেই। আপনার নামটি আজও ভাল ভাবে জেনে নেওয়া হয় নি। অনেকবার ভেবেছি—জিজ্ঞেস ক'র্‌বো; হ'য়ে ওঠে না।"

২

"নামটা ছাড়া যার আর অন্য কোনো পরিচয়ই নেই, তার সে নামটারও কোনো মূল্য নেই। যা হয় একটা কিছু ব'লে ডাকলেই চল্‌'বে; কিন্তু—'আপনি', 'আজ্ঞা' ইত্যাদির ভারটা আর ঘাড়ে চাপাবেন না।"

ললাটটা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া, ক্ষণেক ভাবিয়া লইয়া, মেজর বলিলেন—"ঠাকুর্দ্দা তো আপনাকে 'অনি' কিংবা ঐ রকম কি একটা ব'লে ডাক্‌তেন, শুনেছি। পূরো নামটা বোধ হয় শুনি নি—কোনো দিন।"

"দাদামশায়ের সঙ্গে সঙ্গেই যার বাঁধনের শেষ সূতোটি পর্য্যন্ত ছিঁড়ে গেছে, তার আর অতীতের জীর্ণ সম্বল—শুধু নামটাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি বলুন? ছেলেবেলা থেকে যা কিছু আমার ব'ল্‌তে ছিল, আজ আর তার কোনো চিহ্নও নেই। তাই ব'ল্‌ছিলুম—ঐ নামটাকে কেবল আঁক্‌ড়ে ধ'রে আর লাভ নেই। দাদামশায় ডাক্‌তেন, ইচ্ছে হ'লে আপনিও সেই 'অনি' ব'লেই ডাক্‌বেন। তবে বর্ত্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে ব'ল্‌তে হ'লে, এখন আমার পূরো নামটা হওয়া উচিত—'অনামিকা' কিংবা 'অনাথা'। যা'ক্‌, দয়া ক'রে আমায় 'আপনি' না ব'লে, 'তুমি' ব'লে সম্বোধন ক'র্‌লেই সুখী হব। নামের মূল্য বিশেষ কিছু নেই; ওটা শুধু 'বহুর' ভিতর থেকে একজনকে বেছে নেবার একটা সঙ্কেত মাত্র। সুতরাং ডাক্‌বার বেলায় যা ব'লেই ডাকুন, তাতে কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। তাই ব'লে অবশ্য 'তুমি'র যোগ্যকে 'আপনি' বলা চলে না; কারণ, পদমর্য্যাদার কথা এসে পড়ে। নয় কি?"

অনি তাহার স্বাভাবিক মাধুর্য্যের সহিত অল্প হাসিল।

"তা বুঝি। কিন্তু হঠাৎ 'তুমি' ব'ল্‌তে কেমন একটু বাধো-বাধো লাগে।"

মেজরের কথা শেষ না হইতেই, তাড়াতাড়ি ঘরের আলোটি ক্ষীণ করিয়া দিয়া, স্মেলিং সল্টের শিশিটা তাঁহার হাতে দিয়া অনি বলিল—"আপনার শরীর অসুস্থ। ব'ল্‌ছিলেন—মাথা ধ'রেছে। বেশী কথা ব'ল্‌বেন না। যে পরিচয়টুকু না জেনে এই দেড় মাস সময়ও বেশ কেটে গেছে, সেটার অভাবে আরো তু' এক-দিন কাটানোর কোনো অসুবিধাই হবে না। পরে একদিন সব জেনে নিলেই চ'ল্‌বে। আপনি একটু বিশ্রাম করুন; আমি ইউডিকোল্‌নের শিশিটা নিয়ে আসি।"

পর্দ্দাটা টানিয়া দিয়া, অনি পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে তাহার মন্থর গতির দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেশ-বিদেশের যে সকল সম্ভ্রান্ত ও সুসভ্য সমাজের মহিলাদের সঙ্গে তিনি মিশিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে এই নারীটির যেন একটা অস্বাভাবিক রকমের পার্থক্য আছে। নারী এত ধীর ও অচঞ্চল—তাঁহার চোখে খুব কমই পড়িয়াছে। অথচ ইহার চাল-চলন, কথাবার্ত্তা—সব কিছুর মধ্যেই যথেষ্ট সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। অসামান্য রূপের সঙ্গে রুচি ও শিক্ষা-দীক্ষার একটা নিখুঁত সামঞ্জস্য যেন তাহার সবটুকু সত্বাকে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া আছে। চরণের ধীর তাল সুরের পর্দ্দায় পর্দ্দায় পরশ দিয়া চলে। আয়ত নীল চোখ তুইটি লাবণ্যময় যৌবন-শ্রীকে আরও মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

ইউডিকোল্‌নের জলে থিন্ লিনেনের পটিটা ভিজাইয়া মেজরের কপালে দিয়া, অনি পাশের ইজিচেয়ারে বসিয়া হাতপাখায় বাতাস

দিতে লাগিল। ডাক্তারবাবু নিমীলিত নেত্রে শয্যায় পড়িয়া কি ভাবিতেছিলেন। অনিও অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া বাতাস দিতেছিল। সহসা শিথিল পাখাখানি ডাক্তার বাবুর কপালের উপর পড়িতেই উভয়ের চমক ভাঙিয়া গেল। অনি তাহাতে লজ্জিতা হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতেই, তিনি বলিলেন—

"এতে লজ্জিত হবার কিছুই নেই। আপনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন; কিন্তু আমার মনে হয়—ওটা অনাত্মীয়তার সঙ্কোচ। ঐটাই আমি বরদাস্ত ক'র্‌তে পারি না। কাছে থেকেও মানুষের সঙ্গে যদি মানুষের অনাসক্ত ভাবটাই প্রবল থেকে যায়, তবে দূরেরটা যে চক্রবালের মত চিরদিন নাগালের বাইরেই পড়ে' থাক্‌বে তাতে আর সন্দেহ কি? আপনি—তুমিও তো কোনো অংশেই তার চেয়ে বেশী কাছে আস্‌তে চাও ব'লে মনে হয় না। আমার এখানে মাত্র কয়েক দিন থেকেই তুমি হাঁপিয়ে প'ড়েছ। গুরুগিরি, না হয় নার্সিং—যা হোক্ কিছু না হ'লেই যে তোমার জীবিকা চ'ল্‌তে পারে না, সেটা আমি কোনো মতেই স্বীকার ক'রবো না। যদি দোষ না নাও, তবে ব'ল্‌তে চাই—সাহায্য নেওয়া নয়, বন্ধুত্বের দাবীতেও তো আমার এই সামান্য আয়ের অংশ নিয়ে তোমার চ'ল্‌তে পারে! অনি, সত্যি কি তোমায় বন্ধু হিসাবেও কাছে রাখ্‌বার অধিকারটুকু পেতে পারি না?"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সহসা লজ্জিত হইয়া ডাক্তার সেটাকে চাপা দিবার উদ্দেশে বলিলেন—"না—না, আমি অন্য কোনো ভাবে বলি নি। আপনার দাদামশায়ের মৃত্যুর পর যখন আপনি আমার আশ্রয়ে আস্‌তে আপত্তি ক'রেছিলেন, তখন আপনাকে যে আশ্বাস দিয়েছিলুম, এখনো স্পর্দ্ধার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে

ঠিক তাই ব'ল্‌ছি যে, আপনি আমার মনুষ্যত্বকে অবিশ্বাস ক'র্‌বেন না ; আমার দ্বারা আপনার সম্মান কখনই ক্ষুণ্ণ হবে না। আপনি যদি মনে করেন যে, এখানে কোনো অসুবিধা হ'চ্ছে, আমি আপনার জন্যে আলাদা বাসা ঠিক ক'রে দিতেও প্রস্তুত আছি।"

মেজরের সৌজন্যে অনি লজ্জিতা হইয়াই বলিল—

"ও কথা ব'ল্‌বেন না। আমি আর কোনো দিনের জন্যেই সে কথা ভাবি নি। আপনার কাছ থেকে যা পেয়েছি, তা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেও পাওয়া যায় না। বন্ধু কেন! আপনি আমার পরম আত্মীয় ও আশ্রয়দাতা। আপনি ও কথা ব'ল্‌ছেন কেন? আমি তো আপনার এইখানে—আপনার কাছেই আছি।"

"না অনি, এ কাছে থাকার মধ্যে যেন কোথায় একটা মস্ত ফাঁক আছে। জীবন আর মৃত্যু অনবরত পাশা-পাশি থাক্‌লেও, একটা সূক্ষ্ম পর্দা যেমন তা'দিকে চিরদিনই তফাৎ ক'রে রেখেছে, কোনো মতেই কেউ কারো রহস্য ভেদ ক'র্‌তে পার্‌ছে না ; তোমার আমার মধ্যেও যেন কতকটা তেমনি ভাবই র'য়ে গেছে। আমার মনে হয়, কোথায় যেন তোমার একটু তৃপ্তির অভাব—"

মেজরের কথা শেষ না হইতেই অনি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—"আমার কোনও তৃপ্তি, কোনও শান্তিরই অভাব তো নেই। আপনি নিজে কষ্ট ক'রে আমার জন্যে যা ব্যবস্থা ক'রেছেন, তাতে আমার কোন অসুবিধাই থাক্‌তে পারে না। দেশে যে দু-একজন আত্মীয় আছেন, বিপদে পড়ে' তাঁদের অনেকের কাছেই সাহায্য চেয়েছিলুম ; তাঁরা পত্রের উত্তর দিয়েও আমার এই বিপদের সময় একটু সহানুভূতি দেখাবার

অবসর পান নি। মা তাঁদের আগে থেকেই চিন্‌তেন; তাই তিনি কারও আশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে দেশের ভিটেটুকু আঁকড়ে থাক্‌তে পারেন নি। আপনি যে দয়া ক'রে আমায় আশ্রয় দিয়েছেন—বিদেশে বিপন্ন অবস্থায় রক্ষা ক'রেছেন, তার চেয়ে বেশী আর কি আশা ক'রতে পারি!"

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে অনির বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে মেজরের মুখপানে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—

"আপনার অনুগ্রহ পেয়েছিলুম ব'লেই জীবন-জোড়া একটা মস্ত অনুশোচনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। দাদুর সেই দারুণ রোগের সময় কি বিপন্নই যে হ'য়েছিলুম, তা একমাত্র ভগবান জানেন। আপনি দয়া ক'রে আমার ভার হাতে তুলে নিয়েছিলেন; তাই মর'বার সময়ও দাদু তাঁর শোক-সন্তপ্ত জীর্ণ হৃদয়ের শেষ নিঃশ্বাস একটু সোয়াস্তির সঙ্গে ফেলে গেছেন। এই নিরাশ্রয়া—অনাথাব জন্যে—"

অনিকে নিরস্ত করিয়া মেজর একটু আক্ষেপের সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন—"নাঃ, অনি, শুধু কৃতজ্ঞতার বোঝা চাপিয়ে নিজেকে হাল্কা ক'রতে চাও; কিন্তু আমি তো তার দাবী করি না।"

"প্রত্যুপকার ক'র্‌বার ক্ষমতা সকলের না থাক্‌তে পারে, কিন্তু উপকারীর কৃত-উপকারকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার ক'র্‌বার কৃতজ্ঞতাটুকু সবারই থাকা উচিত। সেটা না থাকাকে আমি সত্যি খুব ঘৃণা করি ডাক্তার বাবু। যাক্ গে সে সব কথা, আপনি আর বেশী ব'কে-ব'কে জ্বরটা তুলে ফেল্‌বেন না। কাছে না পাওয়ার অভিযোগ সর্ব্বদাই করেন; কিন্তু আমি কাছে আস্‌তে

চাই না শুধু ঐ জন্যেই—যে, আপনি কোনো লোককে কাছে পেলেই কেবল আবল-তাবল ব'কতে সুরু করেন। আমি বাতাস দিচ্ছি, আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন; নইলে উঠে যেতে বাধ্য হব।"

মেজর পাশ ফিরিয়া চোখ বন্ধ করিলেন। ইচ্ছা থাকিলেও বলিতে পারিলেন না—কেন তিনি অবিশ্রাম বকিয়া যাইতে চান। পুরুষেরও হারানোর ব্যথা আছে—সে ব্যথা নারীর চেয়ে কম নয়।

তিনি নিঃশব্দে ঘুমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্যর্থতা জ্ঞাপনের ভান করিতেও তাঁহার সাহস হইল না। এই নারীর দৃঢ় আদেশগুলির প্রতিবাদ করিবার সাহস তাঁহার ছিল না। সেই দৃঢ়তার মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল, যাহা তাঁহার প্রকৃতির সঙ্গে আদৌ মিল খাইত না; অথচ কেন যে তিনি তাহা না মানিয়া পারিতেন না, তাহার কৈফিয়তও নিজের কাছেই দিতে পারেন না। তিনি বুঝিতেন, অনি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ বলিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিলেও, তাঁহাকে ভয় করে না।

গম্ভীর ভাবে বসিয়া অনি ধীরে ধীরে হাত-পাখাখানি সঞ্চালিত করিতে লাগিল। সে ইচ্ছা করিয়াই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল, যাহাতে ডাক্তার পুনরায় কথা বলিবার সুযোগ না পান। এই নিস্তব্ধতা ডাক্তারের ভাল না লাগিলেও ভাঙিবার ইচ্ছা হইল না। স্নেহের আবেশে পোষমানা দুরন্ত শিশুর মত, তাঁহার বাঁধনহারা চঞ্চল চিত্ত-প্রকৃতি অনির এই শান্ত-স্নিগ্ধ শাসনের তলে যেন আপনা আপনি অবশ হইয়া আসিল।

অনি যখন নিঃশব্দে আসন ছাড়িয়া উঠিল, তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। ডাক্তার অনেক-ক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। অনি

মেজরের ঘুমন্ত মুখখানিকে অতি সন্তর্পণে একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। সুগৌর মুখখানির উপর আলোর ছটা পড়িয়া একটা স্বপ্নময় মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মেজরকে দেখিয়া অবধি অনির মনের নিভৃত কোণে থাকিয়া থাকিয়া যেন কিসের একটা অজ্ঞাত আকর্ষণ জাগিয়া উঠিত ; কিন্তু সংযত-স্বভাবা অনি তাহার কোনো কারণই খুঁজিয়া পাইত না। নিজের সেই দুর্ব্বলতাটুকুকে দমন করিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া চলিত। মনকে জোর করিয়া শাসন করিলেও দেখার লোভটুকুকে অনি আজ কোনোমতেই সংবরণ করিতে পারিতেছিল না।

টেবিলের উপর হইতে সেজ্‌টাকে সরাইয়া আড়ালে রাখিয়া, অনি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিতেই, অনি যখন পথের পাশের জানালা খুলিয়া দাঁড়াইল, তখন বেলা প্রায় সাতটা। রৌদ্রের সোণালী আঁচল পল্লবিত তরুর ছায়ান্তরাল ভেদ করিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। সহসা মেজরের কথা মনে হইতেই অনি একটু লজ্জা বোধ করিল। এত বেলায় সে কখনই শয্যাত্যাগ করে না। ডাক্তারবাবু খুব সকালে উঠিয়া চা ও জলখাবার খাইয়া বাহির হইয়া যান। এখানে আসিবার পর হইতে, অনি তাঁহার সকাল-বিকালের চা ও জলখাবার-টুকু ঠিক করিয়া দিবার ভার স্বেচ্ছায় নিজেই গ্রহণ করিয়াছিল। অনি ডাক্তারবাবুর সহিত বেশ অবাধে মেলামেশা করিতে পারিত না। একটা অকারণ সঙ্কোচে সে সর্ব্বতোভাবে

তাঁহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিত ; কিন্তু তাহার সেবাপরায়ণা নারী-প্রকৃতি সেই উপকারী বন্ধুর সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে একবারে উদাসীন থাকিতে পারে নাই।

বাবুর্চ্চি ও বেয়ারার অনুগ্রহের উপর ডাক্তারের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সুবিধা-অসুবিধা নির্ভর করিত। অনি প্রথম প্রথম তাহাদের কাজকর্ম্মের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। এইরূপে দেখিতে দেখিতে, আপনার অজ্ঞাতসারে, সেই বাঁধনহারা উদাস কর্ম্মশ্রান্ত পথিকের সর্ব্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্যের ভার সে ক্রমে ক্রমে আপন হাতে তুলিয়া লইয়াছিল।

মেজরের গত সন্ধ্যার অসুস্থতার কথা মনে হইতেই নিমেষে অনির কর্ত্তব্যজ্ঞান যেন তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে চাবুক মারিয়া সচেতন করিয়া তুলিল। যিনি তাহার আত্মীয় অপেক্ষাও মঙ্গলার্থী, বন্ধু অপেক্ষাও হিতৈষী, বিদেশে নিঃসহায় ও বিপন্ন অবস্থায় একমাত্র যাঁহার অনুগ্রহ ও সহানুভূতি তাহাকে আজিও নারীত্বের সকল গৌরব লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার সম্বল দিয়াছে, তাঁহার অসুস্থতায় সে নিজের এই উদাসীনতাকে কোন মতেই ক্ষমা করিতে পারিল না। ত্রস্তপদে ডাক্তারের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিল দ্বার তখনও রুদ্ধ ; রাত্রে সে যেরূপভাবে দরজাটী টানিয়া বাহির হইতে আট্‌কাইয়া গিয়াছিল, এখনও ঠিক সেই ভাবেই আছে। গৃহকোণে ক্ষীণ সেজ্‌টী তখনও মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল।

অনি ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মেজর তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই ;—মোটা 'রাগ'খানি আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছেন। হঠাৎ এ অবস্থা দেখিয়া তাহার মনটা আঁৎকাইয়া উঠিল। নিঃশব্দে

শয্যাপার্শ্বে আসিয়া গায়ে হাত দিতেই, ডাক্তার একটা ক্ষীণ কাতর শব্দ করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। অনি তাঁহার কপালে হাত দিয়া দেখিল—প্রবল জ্বরে উত্তপ্ত হইয়াছে।

নিমেষে অনির সমস্ত সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। অতি নিবিড়ভাবে ডাক্তারের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, কপালে জলপটী দিয়া, সে আস্তে আস্তে তাঁহার চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাইতে লাগিল। অনির মনে হইতেছিল—তাহারই সর্ব্বস্বাস্তকারী গ্রহদেবতার নিষ্ঠুর প্রকোপেই বোধ হয় এই উদার, মুক্তহস্ত আশ্রয়দাতার মহৎ জীবনকে নির্য্যাতিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে ডাক্তার চোখ মেলিয়া একবার অনির মুখের দিকে চাহিলেন। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বুক ঠেলিয়া উঠিতেছিল। অনি উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কি খুব কষ্ট হ'চ্ছে?"

ডাক্তার বলিলেন—"বিশেষ কষ্ট হয় নি; তবে জ্বরটা বোধ হয় একটু বেশী হ'য়েছে। বনবিহারীকে একবার খবর দিলে ভাল হ'ত। আপনি একা—"

অনি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"তাতে কি হ'য়েছে! সে জন্যে আপনি মোটেই ব্যস্ত হবেন না। বনবিহারীবাবুকেও আমি এখনি খবর পাঠাচ্ছি।"

বনবিহারীর নামে যেন সেও মনে মনে একটু ভরসা পাইল।

বনবিহারীবাবু মেজর রায়ের একজন বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি মোগলসরাইএর রেলওয়ে ডাক্তার। পূর্ব্বে দুই একবার নিমন্ত্রণ উপলক্ষে বনবিহারীবাবু এখানে আসিয়াছিলেন। অনির সঙ্গেও তাঁহার অল্প-বিস্তর আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার স্বভাবের

ভিতর এমন একটা মিশুক্ ও মোলায়েম ভাব আছে, যাহাতে তিনি অতি অল্পক্ষণের আলাপেই অনির নিকট অনেকখানি আত্মীয়তার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

শেল্‌ফের উপর হইতে একখানি চিঠির কাগজ টানিয়া লইয়া, অনি তখনই ডাক্তার রায়ের প্রবল জ্বরের কথা জানাইয়া বনবিহারী-বাবুকে আসিবার জন্য লিখিল। সে বনবিহারীবাবুর পূরা নাম ও ঠিকানা জানিত না। অনি বনবিহারীবাবুর নিকট যাহা শুনিয়াছিল, ডাক্তার রায়ের নিকট হইতেও সেই উপাধিহীন নাম ও রেল-কোম্পানী-সংশ্লিষ্ট পদমর্য্যাদাটুকুর বেশী আর কিছুই জানিতে পারে নাই। নাম জিজ্ঞাসা করিলেই, বনবিহারীবাবু একটা কাব্যের দোলা দিয়া কেবলমাত্র বলিতেন—"বন্ বে-হা-রী," ও সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিতেন যে, সেইটুকুর বেশী আর কোনো পরিচয়েরই দরকার হইবে না। সুতরাং ডাক্তারকে সে বিষয়ে পুনরায় কোন প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া, অনি বেয়ারাকে ডাকিয়া পত্রখানি সত্বর মোগলসরাই-এর ডাক্তারসাহেবের কুঠীতে পৌছাইয়া দিবার আদেশ দিল। বেয়ারা শিউকিষণ্ বনবিহারীবাবুকে বিশেষরূপ চিনিত; এবং পূর্ব্বেও সে বহুবার বনবিহারীবাবুর নিকট পত্রাদি পৌছাইয়া দিয়াছে।

স্নেহের বন্ধন বা রক্তের কোন যোগসূত্র না থাকিলেও, অনি ডাঃ রায়ের অসুখে বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। অদৃষ্টের গতিচক্রে তাহার কেন্দ্রচ্যুত জীবন যে বিরাট শূন্য-পথে ছুটিয়া চলিয়াছিল, সেখানে ডাঃ রায়ের আকর্ষণ ও সহানুভূতি না পাইলে, তাহা চিরদিনের মতই লুপ্ত হইয়া যাইত। ডাক্তারের সেই কৃত-উপকার ও মহত্ত্বকে অনি শ্রদ্ধা করিয়াছিল বটে, কিন্তু

সেই দারুণ আকর্ষণের প্রতিক্রিয়া সে আর কোনোদিন এমন করিয়া উপলব্ধি করে নাই।

*　　*　　*　　*

বিকালের গাড়ীতে বেয়ারার সঙ্গেই বনবিহারীবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

মেজরকে যথারীতি পরীক্ষা করিয়া বনবিহারীবাবু ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। ডাক্তারেরা নিজের চিকিৎসা নিজে কখনই করেন না—সেটা সংস্কার বা অক্ষমতা যে কোন কারণেই হউক! বনবিহারীবাবুকেই মেজরের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে হইল।

৩

অনির অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, বনবিহারীবাবু সে রাত্রে মেজরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই আতিথ্য স্বীকারে বনবিহারীবাবুরও যে বিশেষ আগ্রহ ছিল না— তাহা বলা যায় না; অন্ততঃ অনির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের প্রথম সুযোগ হিসাবে। নিত্য নূতন বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপনের বেশ একটু নেশা তাঁহার বরাবরই ছিল।

তখন সন্ধ্যা। অনি তখনও মেজরের মাথার কাছে বসিয়া তাঁহার কপালে জলপটী ও বাতাস দিতেছিল। বেয়ারা অনেকক্ষণ আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে। বনবিহারীবাবু বাহিরের খোলা বারান্দায় পাইচারি করিতেছিলেন। মেজরের তখন একটু তন্দ্রাভাব হইয়াছে দেখিয়া, অনি বনবিহারীবাবুর চা ও জল-

খাবারের ব্যবস্থা করিবার জন্য আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

*   *   *   *

খাবার ও চায়ের বাটী বয়ের হাতে দিয়া অনি ঘরে ফিরিয়া আসিল। বনবিহারীবাবু তখন কোট খুলিয়া, ইজি চেয়ারখানার উপর বসিয়া ডাক্তারের রেসপিরেশান্ দেখিতেছিলেন। অনি ও তাহার পিছনে চা-সহ বয়কে দেখিয়া তিনি টেবিলের পাশে উঠিয়া আসিলেন।

বয়ের হাতে এক পেয়ালা চা ও একজনের মত খাবার দেখিয়া বনবিহারীবাবু ঈষৎ উষ্ণতা মিশ্রিত দুঃখের সহিত বলিয়া উঠিলেন —"নাঃ—অনিমা দেবী, এ তো হ'তে পারে না। এ যে কোন্ দেশী ভদ্রতা তা বুঝি না। আমি একা খাবো, আর আপনি ব'সে থাক্‌বেন!—সে হ'তেই পারে না। এই বয়! মায়ী-জী-কো চা ঔর খানা কাঁহা? যাও—আভি হি য়া লেয়াও—তুরন্ত্ "

বেচারা বয় বিব্রত হইয়া অনির দিকে চাহিতেই, অনি হাসিয়া বলিল—"নিরীহ 'বয়'কে ধমক্ দেওয়া মিছে। সে ওর বেশী কেক্ বিস্কুটও পাবে না—চা'ও আর নেই। আর থাক্‌লেও যে বিশেষ সুবিধে হ'ত—তা নয়। আমি মোটেই ও-সবের ভক্ত নই। ছেলেবেলা থেকে আজ পর্য্যন্ত চা-বিস্কুটের সঙ্গে চাক্ষুষ ভিন্ন ব্যবহারিক সম্বন্ধ কখনই হয় নি। যাক্, আপনি আগে খেয়ে ফেলুন। দেরী ক'রবেন না—চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।"

"তা না হয় খেলুম, কিন্তু সেটা কি ভালো দেখায়। আপনি যখন খানই না, তখন অবশ্য আমার ব'ল্‌বার কিছুই নেই। কিন্তু

ছেলেবেলা থেকে খান না ব'লেই যে কখনো ভদ্রতা রক্ষার জন্যেও খাওয়া যায় না—তা আমি মান্‌তে পারি না।"

বনবিহারীবাবু চায়ের বাটীতে একটা চুমক দিলেন।

অনি সে অভিযোগের কোন প্রতিবাদ করিল না দেখিয়া বনবিহারীবাবু একটু জয়ের প্রফুল্লতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"অভ্যস্ত না হ'লেই যে, সে কাজটা কখনো ক'র্‌তে হবে না—সেটা 'লেম্ এক্সকিউজ্' ভিন্ন কিছুই নয় ; বুঝলেন মিস্!"

অনি বনবিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া, নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার অকারণ-জয়োল্লাসের ভাবটা লক্ষ্য করিয়া, মনে মনে হাসিতেছিল।

বনবিহারীবাবু পুনরায় বেশ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"কেমন—মিস্! ওটা মানেন তো?"

অনি অল্প হাসিল।

বনবিহারীবাবু এই হাসির অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন—"এই যেমন ব'ল্‌ছিলেন যে, অভ্যস্ত নন ব'লেই চা বিস্কুট ভদ্রতা রক্ষার জন্যেও খেতে পারেন না।"

"অন্যায় অভিযোগ! আমি তা বলিনি ক্যাপ্টেন! অভ্যস্ত নই ব'লেই যে, ভদ্রতা রক্ষার জন্যেও খাবো না—তা ঠিক নয়। কেক্ বিস্কুট ইত্যাদি জিনিষগুলো কোন কালেই আমার বাপ পিতামহ খান নি। রোষ্ট-ফাউল-কেক্ যাকে আপনারা সুখাদ্য ব'লে মনে করেন, সেটা অন্যের কাছে ঠিক তা না হতেও পারে! খাওয়ার ব্যাপারটা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের চেয়ে রুচির উপরেই বেশী নির্ভর করে। আমি মাছ, মাংস, ডিম্, চা খাই না। নিজে খাই না ব'লেই যে আমি সেগুলোকে ঘৃণার চোখে দেখি, তা ভাব্‌বেন না। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে একটু নিয়ম-নিষ্ঠা থাকা দরকার।

পুরুষেরা না মান্‌লেও, মেয়েদের অন্ততঃ কতকগুলো মেনে চলা উচিত। তা ছাড়া, চা একটা নেশার সামিল ব'লে, আমি আরো বেশী এড়িয়ে চলি।"

বনবিহারীবাবু সহাস্যে উত্তর করিলেন—"চমৎকার! এ যুক্তি খণ্ডন করা যায় না। তবে বাপ পিতামহ খান নি, সুতরাং খাবেন না—এটা নিছক্ সংস্কার। আপনাদের মত শিক্ষিতা আধুনিক মহিলাদের ভিতরেও যে কুসংস্কারের বালাই এখনো এত দৃঢ়মূল, তা জানতুম না।"

শেষের কথাটুকু বনবিহারীবাবু একটু শ্লেষের সঙ্গেই বলিলেন।

অনি তাঁহার শ্লেষটুকু লক্ষ্য করিয়া দৃঢ় অথচ মোলায়েমভাবে বলিল—"আমাকে শিক্ষিতা শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করাটাই যে আপনার ভুল হ'য়েছে বনবিহারীবাবু! শিক্ষিতা হ'তে পারি নি ব'লেই কুসংস্কারের মোহগুলো এখনো কাটিয়ে উঠ্‌তে পারি নি। আপনাদের পক্ষে ওগুলো উড়িয়ে দেওয়া যত সহজ হ'য়েছে, মূর্খের পক্ষে তত সহজ কখনই হ'তে পারে না। তা ছাড়া এগুলোকে কুসংস্কার ব'লে যে আপনারা নিতান্ত ঘৃণা ও অবহেলার চোখে দেখেন—সেটাকেও আমি ঠিক্ ভালো ব'লে মেনে নিতে পারি না। আহার ব্যবহার প্রভৃতি প্রত্যেক কাজের ভিতরেই সামাজিক যে সব বাঁধাবাঁধি আছে—সেগুলোকে আমি সংস্কারের বাঁধন বলি না; সেগুলো হ'চ্ছে সামাজিক বা জাতীয় বিশিষ্টতা। অর্থাৎ আপনি যাকে বলেন—কুসংস্কার, আমি তাকে বলি 'স্বাতন্ত্র্য'। এই স্বাতন্ত্র্য হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সবারই আছে। যার নেই—সে দুর্ব্বল—সে কাপুরুষ।"

কথাগুলির মধ্যে যে বেশ একটু উত্তাপ ছিল, তাহা বনবিহারী-

বাবুর উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না। কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া তিনি অনির দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহু পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন; বিশেষতঃ সামাজিক বিষয় লইয়া কোনো তর্ক বা আলোচনা সুরু হইলে অনি অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিত। নিয়ম-নিষ্ঠা সম্বন্ধে অনির গোঁড়ামির কথা তিনি মেজরের নিকট শুনিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে তর্ক বাধাইবার চেষ্টাও দুই একবার করিয়াছিলেন। কিন্তু সংযত-স্বভাবা অনি সংক্ষেপে দুই একটী উত্তর দিয়াই তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। অনির মধ্যে এতখানি তেজস্বিতার ভাব তিনি কখনই লক্ষ্য করেন নাই।

বনবিহারীবাবুর স্বভাবের মধ্যে একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি উদ্গত ক্রোধ ও ঘৃণাকে সহসা হজম করিয়া, সরল হাসিতে প্রতিপক্ষকে বিব্রত করিয়া তুলিতে পারিতেন। তাঁহার অস্বাভাবিকরূপে সরল ও বিস্ফারিত চক্ষু দুইটীই ছিল সেই আত্ম-গোপনের একটা মহৎ প্রচ্ছদপট।

বনবিহারীবাবু মুহূর্ত্তে তাঁহার বিশাল চক্ষু দুইটীতে রাশীকৃত সরলতার হাসি মাখাইয়া, অনির দিকে চাহিতেই অনি যেন বিশেষ বিব্রত ও লজ্জিত হইয়া উঠিল। বনবিহারীবাবুর এই স্বভাব-সিদ্ধ কৃত্রিম সরলতার অন্তরালে কিছু ছিল কি না, তাহা সে লক্ষ্য করিবার চেষ্টাও করে নাই। বরং সে যে এত সরল ও অসামাজিক লোকের নিকট অনর্থক আবল-তাবল বকিয়া ফেলিয়াছে কেন, এই কথা ভাবিয়াই মনে মনে না হাসিয়া পারিল না।

মেজরকে ঔষধ দিবার সময় হইয়াছে দেখিয়া, অনি তাড়াতাড়ি তাঁহার পার্শ্বে গেল। মেজরের তন্দ্রা-ভাবটা তখন চলিয়া গিয়াছিল; তিনি এতক্ষণ শুইয়া শুইয়া অনির নিঃসঙ্কোচ যুক্তি-তর্কের আনন্দটুকু

উপভোগ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার চোখে চোখ পড়িতেই অনির মুখখানা লজ্জারক্ত হইয়া উঠিল।

বনবিহারীবাবু ক্ষেত্র বিবেচনা করিয়াই প্রসঙ্গটাকে হঠাৎ উল্টাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প একটু উত্তেজনাতেই অনির যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মুখ চোখের ভিতর যে নিঃসঙ্কোচ ভাবটি ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেটুকুকে আরও অবাধভাবে দেখিবার লোভ তাঁহার যথেষ্টই থাকিয়া গেল।

মেজরকে ঔষধ খাওয়াইয়া অনি তাঁহার কপালে হাত দিয়া দেখিল, তখন জ্বরের বেগ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে; কিন্তু সম্পূর্ণ ত্যাগ হয় নাই। ইহাতে সে মনে একটু ভরসা পাইল, জ্বরটা রাত্রের মধ্যেই ছাড়িয়া যাইতে পারে।

আলোটা একটু আড়াল করিয়া দিয়া, অনি জানালার পর্দাগুলি ভালরূপে টানিয়া দিল; এবং মেজরকে দেখিবার জন্য বনবিহারীবাবুকে আর একবার অনুরোধ করিয়া, তাঁহার রাত্রের আহারের আয়োজন করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল।

মেজর ও বনবিহারীবাবু উভয়েই বোধ হয় তখন অনির কথা ভাবিতেছিলেন। অনির তৎপরতা ও চলাফেরা—প্রত্যেকটী গতিবিধিতেই একটা মাদকতা ছিল। সে মাদকতা মনকে চঞ্চল করার চেয়ে আকর্ষণই করে বেশী।

তিন দিনের মধ্যেও জ্বর সম্পূর্ণ বিরাম হইল না দেখিয়া অনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। বনবিহারীবাবু যথারীতি প্রত্যহই আসিয়া দেখিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার চেষ্টার কোনই ত্রুটি ছিল না। এই দুই দিন জ্বরের বেগও একটু কমিয়াছিল, কিন্তু আজ বিকাল হইতে বুকে ব্যথা ও সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় জ্বর বাড়িয়া উঠিয়াছে। দুশ্চিন্তায় অনির বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এখন আর সহসা বনবিহারীবাবুকে সংবাদ দিবারও কোন উপায় নাই। মোগলসরাই যাইবার শেষ গাড়ী অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই ক্যান্টন্‌মেণ্ট ছাড়িয়া গিয়াছে। হঠাৎ যদি অসুখ বাড়িয়া উঠে, সে কি করিবে, তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতেছিল। স্থূল-বুদ্ধি শিউকিষণ্ ও বয় বিশেষ প্রভুভক্ত হইলেও, রোগীর পরিচর্য্যা বিষয়ে অনি তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। বনবিহারীবাবু সকালে আসিয়া যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, অবস্থান্তর ঘটিলেও তাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না, সে কথা অনি তখন জিজ্ঞাসা করিয়া লয় নাই।

সারারাত্রি বিনা-ঔষধে রাখিলে অসুখ আরো বাড়িয়া উঠিতে পারে—ভাবিয়া, অনি অগত্যা মাড়োয়ারী হাঁসপাতালের ডাক্তার বংশীধরবাবুকে আনিবার জন্য শিউকিষণ্ বেয়ারাকে গাড়ী লইয়া যাইতে বলিল।

কূলহীন সাগরের উত্তাল তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইলে মানুষ যেমন সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার সন্তরণ-ক্লান্ত হাত দুইটি দিয়া যে-কোনো আশ্রয়কে আঁকড়িয়া ধরে, অনিও সেইরূপ তাহার জীবনের দুস্তর পাথারে সন্তরণ-অপটু হাত দুইটী দিয়া এই উদার বন্ধুর আশ্রয়কেই

অবলম্বন করিয়াছিল। সে তো জানিত না—তাহারই দুর্ভাগ্যের দুঃসহ গুরুভারে এ আশ্রয়ও মজ্জমান হইয়া পড়িবে। হায়! সে যদি জানিত যে, তাহার দুর্ভাগ্যের পাপগ্রহ এই আশ্রয়দাতা বন্ধুকেও পীড়ন করিয়া তাঁহার জীবন অমঙ্গলে ভরিয়া দিবে, তাহা হইলে সে অঙ্কুরেই এই অমঙ্গলের সংক্রামক বিষে-ভরা মূলকে আপন হাতে ছিন্ন করিয়া ফেলিত। হিতৈষী বন্ধুর আনন্দময় জীবন-পথে সে অশান্তিব কণ্টক হইতে চাহে না।

অনির ধারণা হইয়াছিল : তাহার সংস্পর্শে আসিয়াই বোধ হয় মেজর অশান্তি ভোগ করিতেছেন। অসুখ হইবার পূর্ব্বেও সে লক্ষ্য করিয়াছিল—মেজর পূর্ব্বের ন্যায় আর সদাপ্রফুল্ল থাকিতে পারিতেন না। অনি এখানে আসার পর হইতে তিনি ক্রমে ক্রমে গম্ভীর হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার মুখে একটা অশান্তির ম্লান ছায়া অনি অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছে। ইদানীং যেন প্রায়ই একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বুকে জমিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু কেন? অনিকে তিনি কোন দিন কোন প্রসঙ্গেই তাঁহার বেদনার আভাস বুঝিতে দেন না।

নানা খণ্ড-চিন্তায় অনির মনটা উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। মেজরের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধসূত্র না থাকিলেও, সে তাঁহাকে কোন সময়ের জন্যই আর পর ভাবিতে পারে না। রক্তের সম্পর্কে যাহাদের সহিত আত্মীয়তার দাবী লইয়া সে জন্মিয়াছিল, বিপন্ন জীবনের আর্ত্ত-আহ্বানে অনি তাহাদের কোন সাড়াই পায় নাই।

বেয়ারা আসিয়া জানাইল—ডাক্তারসাহেব আসিয়াছেন। অনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে উপরে আনিবার জন্য বলিয়া

দিল। জ্বরের বেগ যথেষ্ট প্রবল হইলেও মেজর তখনো সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। অনিকে অত্যন্ত ব্যস্ত হইতে দেখিয়া, তিনি তাঁহার রোগক্লিষ্ট চোখ দুইটী তুলিয়া অনির মুখ পানে চাহিলেন। অনি কাছে সরিয়া আসিতেই তাহার হাতখানি কপালের উপর টানিয়া লইয়া মেজর বলিলেন—

"বসুন, ব্যস্ত হবার কোনই দরকার নেই; শিউকিষণ্ তাঁকে সঙ্গে ক'রে উপরেই নিয়ে আস্‌চে। আমি নিষেধ করেছি কি না, তাই আর ওরা খবর না দিয়ে কা'কেও উপরে নিয়ে আসে না।"

"হাঁ,—না—তার জন্যে তো আমি ব্যস্ত হই নি। তিনি দেখে গেলে অন্ততঃ এখনি একটা ওষুধের ব্যবস্থা হ'বে—তাই।"

অনি নতমুখে মেজরের কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। মেজরের যাতনা-ক্লিষ্ট ম্লান মুখের উপর তৃপ্তির যে শান্ত ভাবটা তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও, অনি যেন তাহাতে একটু সাহস পাইল।

বংশীধরবাবু ঘরের মধ্যে আসিতেই অনি বিছানা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। মেজরকে সম্মানসূচক অভিবাদন করিয়া বংশীধরবাবু পাশের চেয়ারে বসিয়া সযত্নে তাঁহার উত্তাপ, বুক ও শ্বাসপ্রশ্বাস বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মেজর নিজের রোগ সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিতেছিলেন। ডাক্তারকে উপসর্গ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা জানাইয়া, তিনি বুক ও রেস্-পিরেশনটা ভালরূপে দেখিবার জন্য বলিয়া দিলেন। বংশীধরবাবু মেজরের নির্দেশ মতই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। রোগ সম্বন্ধে দুই একটা মতামত প্রকাশ করিলেও মেজর যে বেশ একটা

উদাসীনতার সহিত নিজের এই অসুখকে তাচ্ছিল্য করিতেছিলেন, তাহা অনি আগাগোড়াই লক্ষ্য করিয়াছিল।

মেজর বামপার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দেখাইয়া নিউমোনিক অ্যাফেক্শানের আশঙ্কার কথা জানাইতে, বংশীধরবাবু গভীর মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনি উদগ্রীব হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করার পর ডাক্তার মেজরের কথা সমর্থন করিয়া বলিলেন—"হাঁ, নিউমোনিয়াই তো মালুম হোতা; বোথ্ সাইড্স্—।"

নিউমোনিয়া! অনির বুকের মধ্যে যেন সমস্ত রক্ত একসঙ্গে তোলপাড় করিয়া উঠিল। নিউমোনিয়াই যে তাহার জীবনের অনেক আসন শূন্য করিয়া দিয়াছে! বিহ্বল হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দনে অনির গলা যেন শুকাইয়া আসিতেছিল। অগ্নিদগ্ধ যেমন রক্তসন্ধ্যা দেখিয়াই শিহরিয়া উঠে, অনিও সেইরূপ একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল।

বংশীধরবাবু ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বেয়ারার সঙ্গেই নামিয়া গেলেন। আবার সকালে আসিয়া দেখিবার জন্য অনি তাঁহাকে অনুরোধ করিল। বেয়ারার হাতে ঔষধের ফর্দ্দ ও টাকা দিয়া সত্বর ঔষধ লইয়া ফিরিবার জন্য বলিয়া দিল।

অনির সমস্ত মনটা তখন অবশ হইয়া গিয়াছিল। অতীতের কান্নাভরা স্মৃতি, বর্ত্তমানের ম্লান ছায়া ও ভবিষ্যতের অন্ধকার কল্পনা-বিভীষিকায় তাহার বুকের মধ্যে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল। এতদিন যে সঙ্কোচ তাহাকে টানিয়া দূরে সরাইয়া রাখিত, আজ সেই সঙ্কোচের বাঁধন একটা অপ্রত্যাশিত

ঝড়ের আঘাতে নিঃশেষে ছিঁড়িয়া গেল। সযত্নে কম্বলখানি টানিয়া মেজরের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিয়া, অনি পুনরায় তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সস্নেহে কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। তাঁহার প্রতি সঙ্কোচে সে তাঁহার মহত্ত্বকে অশ্রদ্ধা করিয়াছে। নিজের অবিবেচনা-কৃত অপরাধের জন্য অনি নিজেকে ধিক্কার দিল।...তিনি প্রতিদানের প্রত্যাশা করেন না, কিন্তু তাহার তো কর্ত্তব্য আছে!

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া মেজর পরিশ্রান্ত অনিকে বিশ্রামের জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও অনি উঠিল না। সে তাহার নিজের জন্য কোন আয়োজনই আজ করে নাই; কিছু খাইবার ইচ্ছাও তাহার ছিল না। অনি বাবুর্চ্চি ও বয়ের রান্না খাইত না। মেজর অনিকে সে জন্য কোন দিন অনুরোধও করেন নাই। চাকরদিগকে বলিয়া তিনি তাহার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

অনি তখনও স্থিরভাবে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে দেখিয়া, মেজর কর্ত্তব্যের অনুরোধেও একটু ক্ষীণ আপত্তি জানাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অনি তাহাতে বাধা দিয়া বলিল—"তার জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না; আপনি একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা করুন।"

আজ অনির এই সেবা-ব্যাকুলতা মেজরের কাছে বড় ভাল লাগিল। তাহার মুখচোখে যে বিষণ্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে মেজর মনে মনে অপার তৃপ্তি পাইতেছিলেন। মনের আড়ালে যাহা লুটোপুটি খাইয়া মরিয়াছে, কিন্তু সঙ্কোচের চাপে মাথা তুলিতে পারে নাই, আজ তাহা সতেজ নিঃশ্বাসের মত মেজরের বুকের ভিতর খেলা করিতে লাগিল।

মেজরের মনে হইতেছিল—অনি যদি এমনি করিয়া শিয়রে বসিয়া থাকে, তবে ব্যাধির সকল যাতনাই তিনি নীরবে সহিয়া চলিতে পারেন।···

সহসা মেজরের চিন্তাধারাটা যেন কোথায় গিয়া প্রতিহত হইল। মনের সাবলীল কল্পনাটুকু দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। আন্তরিক ইচ্ছা হয়তো ছিল না, তবুও মেজর ভদ্রতার খাতিরে অনিকে বিশ্রাম করিতে যাইবার জন্য আবার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অনি কোনই উত্তর দিল না; নির্ব্বাক বসিয়া আপন মনে তাঁহার মাথায় বাতাস দিতে লাগিল।

মেজর চোখ বন্ধ করিয়া ঘুমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; আর কোনরূপ বাধা দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। এই সেবার দাবী এক অপরিমেয় তৃপ্তিতে তাঁহার সমস্ত মন-প্রাণ ভরিয়া দিল। সেবার ভিতরে এ তৃপ্তি তিনি জীবনে কখনই উপভোগ করেন নাই। হাঁসপাতালে নার্সদের কাছে তিনি যে সেবা ও যত্ন বহুবার পাইয়াছিলেন, এ সেবা-যত্নের তুলনায় তাহা যেন আজ নিতান্ত প্রাণহীন—শুষ্ক বলিয়া মনে হইল। ঘড়ির কাঁটা ও কর্ত্তব্যের মাপকাটিতে মাপা সেই সেবা-যত্নের মধ্যে তিনি এত প্রাণময় স্নিগ্ধ-স্নেহের পরশ কখনই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

অনির স্নেহশীতল স্পর্শে আজ যেন মেজরের বুকের তন্ত্রীগুলি থাকিয়া থাকিয়া আনন্দের সুরে বাজিয়া উঠিতেছিল; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা সঙ্কোচের চোখ রাঙানিতে বেসুরা হইয়া উঠিতেছিল।

স্বভাবতঃ অনি অত্যন্ত ধীর, দৃঢ় ও অচঞ্চল হইলেও রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া তাহার সে দৃঢ়তা নিমেষের মধ্যে উপিয়া যাইত। শৈশবে জ্ঞান-সঞ্চার হওয়ার পর হইতেই মৃত্যুযাত্রীর জীবন-পথে দাঁড়াইয়া যমের সহিত অবিশ্রান্ত হাত-কাড়াকাড়ির পরাজয়ের গ্লানিতে তাহার দৃঢ় চিত্তবৃত্তিগুলি সব অসাড় ও মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিল। এ্যান্টিফ্লোজিষ্টিনের কৌটাটী গরম জলে বসাইয়া অনি তখন ধীরে ধীরে মেজরের বুকের উপর তাহার প্রলেপ দিতেছিল। জীর্ণ মনের এই অবসাদ-অবসরে আজ তাহার অতীতের ব্যথাভরা স্মৃতি যেন বুক ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। এ্যান্টিফ্লোজিষ্টিনের প্রলেপ মাখানোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল সেই স্নেহময় দাদুর কথা, আর মায়ের সেই চিন্তাকুল ম্লান মুখ! ওঃ, মা যে শুধু তার কথা ভাবিয়াই মরণের শেষ নিঃশ্বাসটী পর্য্যন্ত শান্তির সঙ্গে ফেলিয়া যাইতে পারেন নাই! আজও তাহার স্পষ্টই মনে পড়ে—সেই বাবা, মা, দাদু, আত্মীয় বন্ধু—সবারই কথা। একটা প্রলয়ের বন্যা হঠাৎ আসিয়া পৃথিবীর বুক হইতে তাহার সব কিছুই মুছিয়া লইয়া গিয়াছে। সৈদাবাদে গঙ্গার ধারে একখানা ভাড়াটিয়া ছোট্ট বাড়ীতে তাহারা থাকিত। চামেলী, প্রীতি, অমলা, মণিকা—কত বন্ধুই না তাহার ছিল। বাবা তখন পক্ষাঘাতে শয্যাগত; তাঁহার চলাফেরা করিবার ক্ষমতা ছিল না, তবুও তিনি কত ভালবাসিতেন! বাবা যে তাহাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে পাগল হইয়া উঠিতেন। সে যেন এক যুগান্তরের পুরাণো স্মৃতি।

বাল্যের বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী আজ অনির মনে জাগিয়া

উঠিল :—বাবা যখন মারা যান, তখন সবেমাত্র অনি বারো বৎসরে পড়িয়াছে। বাবার মৃত্যুর পর অনেকেই দেশের বাড়ীতে গিয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন। মা তাহাতে রাজী হন নাই। বাবার অসুখের পর হইতেই যেন মা পল্লীগ্রামের উপর অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিলেন। গ্রামের লোকের না কি তখন আর পূর্ব্বের মত সে সরল ও উদার ভাব ছিল না ; সংকীর্ণতা, স্বার্থ ও হিংসায় তাহাদের অকর্ম্মণ্য মস্তিষ্ক পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছিল। এখনো হয় তো ঠিক্ তেমনি আছে।

সৈদাবাদের ছাত্রেরা সকলে মিলিয়া একটী সেবাসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছিল। মা এই সেবাসঙ্ঘের ছেলেগুলিকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। হরিৎ-দা, নিরঞ্জন-দা, পরিতোষ-দা—আরও কত ছেলে মিলিয়া সেই সেবাসঙ্ঘের কাজ করিতেন। বাবার অসুখের প্রথম অবস্থা হইতে শ্মশানের শেষ সৎকার পর্য্যন্ত সব কিছু কাজই ঐ ছেলেরা করিয়াছিল। নিরঞ্জন-দা কত উপকার, কত সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। মা যেদিন সৈদাবাদ ছাড়িয়া কাশীতে দাদুর কাছে আসিবার কথা বলিলেন, সেদিন রাত্রে সঙ্ঘের সকলে আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল—'কাকীমা, আমাদের ভুল্‌বেন না। দরকার হ'লেই সংবাদ দেবেন ; আমরাও আপনার ছেলের মত।' তাঁহাদের কথা মনে হইলে আজিও শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসে।

সৈদাবাদ ছাড়িয়া যেদিন আমরা দাদুর কাছে কাশীতে আসিবার জন্য রওনা হইলাম, মা সেদিন আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কত কান্নাই কাঁদিয়াছিলেন। বাবা যে ঘরখানিতে সর্ব্বদাই থাকিতেন, রোগ-শয্যার সেই প্রথম্ দিন হইতে জীবনের

শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, সে ঘরখানি যেন মায়ের তীর্থ হইয়া উঠিয়াছিল। চলিয়া আসিবার সময় বাবার সেই অন্তিম-শয্যার স্থানটীতে মা কতই না চোখের জল ফেলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

আমাকে সঙ্গে করিয়াই মা নির্ভয়ে পথে বাহির হইতে পারিতেন; কিন্তু সেবারে কাশী আসিবার সময় তিনি নিরঞ্জন-দাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। তেজস্বিনী ও সাহসী মায়ের সব তেজ যেন বাবার সঙ্গে-সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছিল। দাদুকে সংবাদ দিলে হয় তো তিনিই আসিতেন, কিন্তু মা তাঁহাকে আসিতে নিষেধ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন; নিরঞ্জন-দার প্রতি মায়ের অপার স্নেহ ও বিশ্বাস ছিল।

দাদু গাড়ী আসিবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেশনে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদের গাড়ী যখন কাশীতে আসিয়া পৌছিল, তখন দাদুর সে কি ব্যাকুলতা! ব্যস্ত হইয়া দাদু গাড়ীর জানালায় জানালায় মাকে ডাকিয়া বেড়াইতেছিলেন। মায়ের নাম ছিল যোগমায়া। নিরঞ্জন-দা আমাদের হাত ধরিয়া নামাইতেই দাদু ছুটিয়া আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। দাদুর তখনকার অবস্থা দেখিলে হয় তো কেহই বলিতে পারিত না যে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। মাকে দেখিয়া দাদুর হঠাৎ যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে মনে হইল—তিনি হয় তো পড়িয়া যাইবেন। নিরঞ্জন-দা দাদুর হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন। মা কাছে আসিতেই দাদু তাঁহাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। দাদু ও মা কাহারো মুখেই তখন কথা সরিতেছিল না। মাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া দাদু তাঁহার শীর্ণ মুখখানি মায়ের মাথার উপর রাখিয়া কতক্ষণ যে নিশ্চল পাথর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ছিলেন তাহা

বলা যায় না। দাদুর চোখের জলে মায়ের রুক্ষ চুলগুলি সিক্ত হইয়া গিয়াছিল।

নিরঞ্জন-দা গাড়ী ভাড়া করিয়া সকলকে উঠাইলেন। গাড়ীতে উঠিয়া মা দুই হাত জোড় করিয়া বিশ্বনাথকে প্রণাম করিলেন। গাড়ী দাদুর বাসার দিকে রওনা হইল। ওঃ! সে যে কত কাল পূর্ব্বের কথা তাহার ইয়ত্তা নাই। তখন আশ্বিন মাস, চারিদিকে শারদীয়া উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কাশীতে যাত্রীর কত ভিড়! চারিদিকে বোধনের কত ধুম—কিন্তু আমাদের যেন তখন বিজয়া।

বাঙালীটোলায়—সেই দাদুর ছোট্ট বাসাটী; দুইখানি মাত্র ঘর। তবুও কত শান্তিই ছিল—সেই স্নেহ ও সমবেদনায় ভরা বৃদ্ধের পক্ষপুটের তলে! দিদিমণি যে কতদিন পূর্ব্বে সকলকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন তাহা মনে পড়ে না। দাদুর জীবনের একমাত্র সম্বল ছিলেন—মা। দাদু মাকে যেন তাঁহার সমস্ত হৃদয় দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সবই তো নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল। বাবার মৃত্যুর পর হইতে মা প্রতি পলে পলে সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছিলেন। সেই একরাশি কালো চুল, মহাতাপের মত উজ্জ্বল রঙ্—কি অপূর্ব্ব রূপ ছিল মায়ের! কিন্তু একটা ঝড়ের দোলা তাঁহার সব কিছু এমন করিয়া ওলট্-পালট্ করিয়া দিয়াছিল যে, মাকে দেখিয়া আর চেনা যাইত না। মায়ের একমাত্র সন্তান আমি।—আমাকে বুকে করিয়া মা কত সোহাগ, কত আনন্দে ফুলিয়া উঠিতেন! কিন্তু ইদানীং আমাকে দেখিলেই আমার স্নেহময়ী মায়ের চোখ ফাটিয়া শুধুই জল গড়াইয়া পড়িত।

দাদামশায়ের প্রাণপণ যত্ন, চেষ্টা—সব কিছুই ব্যর্থ করিয়া মা আমার বৈধব্যের সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লইলেন। বৃদ্ধ দাদু আমার পাগল হইয়া উঠিলেন। আমি তখন সবেমাত্র ষোল বৎসরে পড়িয়াছি। বেশ স্পষ্ট মনে পড়িতেছে—আজও মায়ের সেই শেষ;—ওঃ! মা! মা আমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মুখখানি নিজের কপোলের উপর চাপিয়া ধরিলেন। মায়ের চোখের জলে আমার মুখ ভিজিয়া গেল। ক্ষীণ একটা আর্ত্তনাদের মত মায়ের ওষ্ঠ দুইটী কাঁপাইয়া শুধু বাহির হইয়া আসিল—"ঠাকুর! অনাথার—উপায়—ক'রো।" তার পর সব শেষ হইয়া গেল। মাগো! এই অভাগা সন্তানের চিন্তায় তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত যে অশান্তির বিষে ভরিয়া উঠিয়াছিল—মা!

অনির অজ্ঞাতসারে তাহার চোখ হইতে বড় বড় দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া মেজরের বুকের উপর পড়িল। অনি তাহা বুঝিতেও পারিল না।

মেজর চোখ মেলিয়া একবার অনির মুখের দিকে চাহিলেন। সে তখনও অন্যমনস্ক হইয়া ছিল। তাহার বেদনাক্লিষ্ট মুখ ও জলভরা চোখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই যেন মেজর সহসা চমকাইয়া উঠিলেন। কিসের এ অশ্রু! এ ব্যথা!! পরক্ষণেই একটা অপরিমেয় তৃপ্তিতে মেজরের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তিনি শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এ যেন তাঁহার জীবনের একটা অনাস্বাদিত তৃপ্তি।

অনি অন্যমনস্কভাবে বসিয়া তখনও ভাবিতেছিল—তাহার দাদুর কথা। মায়ের মৃত্যুর পর" দাদু যেন সর্ব্বান্তঃকরণে

তাহাকেই ঘিরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন। তখন আর দাদু বিশেষ একটা বাড়ীর বাহিরে যাইতেন না ; সর্ব্বদাই পড়াশুনার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চাহিতেন। একমাত্র অনিই ছিল তাঁহার সঙ্গী, ছাত্রী ও কর্ত্রী। সন্তানের মত দাদুকে চালাইতে হইত। দাদু নিজেও যেমন পড়িতেন, অনিকেও সেইরূপ পড়াইতেন। দাদুর নিকটে থাকিয়া অনি কতই না শিখিয়াছিল। শেষের পাঁচ ছয়টী বৎসর যেন দাদামশায় অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত অনিকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাঙ্‌লা, ইংরাজী, সংস্কৃত—গীতা, উপনিষদ্‌, দর্শন—সমস্ত বিষয়ই দাদু নিখুঁতভাবে অনিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। দাদুর যে বড় ইচ্ছা ছিল, যেন তাঁহার আদরের অনিকে উদরান্নের জন্য পরের দ্বারস্থ না হইতে হয়।

বার্দ্ধক্যেও দাদামশায়ের মধ্যে যে অসাধারণ উৎসাহ ও যুবকের ন্যায় কর্ম্ম-পটুতা ফিরিয়া আসিয়াছিল, শীঘ্রই তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। তাঁহার শরীর ও মন অতি দ্রুতবেগে আবার শিথিল হইয়া পড়িল। দাদু নিজেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন। শেষের কয়েকটী দিন তিনি সর্ব্বদাই অনিকে উপদেশ দিতেন—তাহার জীবন-যাত্রার পাথেয়।

সেদিন বিকালে দাদামশায়কে লইয়া অনি গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। দাদামশায়ের শরীরটা ভাল ছিল না। গঙ্গার জলা-হাওয়ায় শীত করিতেছিল বলিয়া দাদামশায় সকাল সকাল বাসার দিকে ফিরিলেন। পথেই তাঁহার প্রবল জ্বর আসিল। চার দিন সমভাবেই জ্বর লাগিয়া থাকিল দেখিয়া

অনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রতিবেশী বল্লভ ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছিলেন। তাঁহার ঔষধে কোন ফল হইতেছিল না এবং রোগীর অবস্থাও আশঙ্কাজনক বুঝিয়া বল্লভবাবু ভাল ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য উপদেশ দিলেন। বৃদ্ধ হরিশঙ্কর তখন নিউমোনিয়াক্রান্ত হইয়াছিলেন।

তখন মাস-কাবার। দাদামশায়ের পেন্‌শনের অল্প যে কয়েকটী টাকার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের জীবনযাত্রা চলিতেছিল, সেই নির্দ্দিষ্ট মাসিক সম্বলও এই কয়েক দিনের ঔষধ পথ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। ক্ষোভে, দুঃখে, গ্লানিতে অনির হৃদয় যেন নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। হায়! তাহার দাদু—দাদু আজ শেষ মুহূর্ত্তে,—বিনা চিকিৎসায়—বিনা পথ্যে—অনাহার-ক্লিষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবেন! এই চিন্তা যেন উত্তপ্ত লৌহ-শলাকার ন্যায় অনির হৃৎপিণ্ডকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল। মর্ম্মান্তিক মনস্তাপে সে যেন হঠাৎ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল।

বিশ্বনাথকে স্মরণ করিয়া অনি পাশের ভাড়াটীয়াদের ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। দাদু তাহাকে কত নিষেধ করিয়াছিলেন; সে মানে নাই। বল্লভবাবু বলিয়াছেন—দাদুর রোগ কঠিন হইয়াছে; সে যেমন করিয়া পারে ভাল ডাক্তার আনিয়া দেখাইবেই। অনি সিভিল সার্জ্জনের বাংলোর উদ্দেশে চলিল। সে জানিত,—দাদুর কাছে সে বহুবার শুনিয়াছিল যে, খাঁটী সাহেব অপেক্ষা কৃত্রিম সাহেবরা সহস্রগুণ হীন। একজন খাঁটী ইংরাজকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু নকল-সাহেবকে বিশ্বাস করা যায় না।

মেজর—কত উদার, কত মহৎ! ভগবান তাহাকে পথ

দেখাইয়াছিলেন। মেজরের সাহায্য না পাইলে সে সময় তাহাদের যে কি হইত, তাহা অনি ভাবিতেও পারে না। চোখে জল আসিল।

সহসা মেজরের কথা মনে হইতেই যেন আচম্বিতে অনির সম্বিত ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি এ্যান্টিফ্লোজিষ্টিনের দিকে হাত বাড়াইতেই অনি দেখিল তাহা অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। লজ্জায় সঙ্কোচে অনি এতটুকু হইয়া জলের পাত্র ও ঔষধের কৌটা লইয়া গরম করিবার জন্য নামিয়া গেল।

অকারণ তৃপ্তি ও আনন্দে বিহ্বল মেজর তখন অনির দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। অপ্রত্যাশিত মানসিক শান্তিতে তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছিল।

৬

বনবিহারীবাবু প্রত্যহই আসিয়া মিঃ রায়কে দেখিয়া যাইতেন। মাড়োয়ারী হাঁসপাতালের ডাক্তার বংশীধরবাবুও যথাসাধ্য চেষ্টা ও তত্ত্বাবধান করিয়া মেজরের চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার অসুখ সহজে কমিল না। জ্বর ও বুকের বেদনা সমান ভাবেই ছিল। অনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে মেজরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। ডাক্তার যথেষ্ট সাহস ও আশা দিলেও, অনি ভরসা করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে সর্ব্বদাই আশঙ্কা হইতেছিল।

অনি যে নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই অধিক বিহ্বল হইয়াছিল, তাহা নহে; যদিও মেজরের বর্ত্তমান জীবনের উপর তাহার

ভবিষ্য-জীবনের অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছিল। মেজরের অসুস্থ অবস্থায় অনি যেদিন তাঁহার সাংসারিক ও পারিবারিক অবস্থার বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিয়াছিল, সেই দিন হইতেই যেন তাহার নারীত্বের স্বভাব-কোমলতা অধিকতর ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনি জানিত যে মেজর কর্ম্মস্থানে একাকী, কিন্তু তাঁহার পশ্চাতের ইতিহাসের পাতাগুলিও যে তাহারই ন্যায় শূন্য ও মরুময় হইয়া গিয়াছিল, তাহা সে পূর্ব্বে কখন ভাবিতেও পারে নাই। অনি যেদিন মেজরের অসুস্থতার কথা বাড়ীতে জানাইবার জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিতে গিয়াছিল, সেদিন মেজরের সেই বেদনা-ম্লান মুখ ও একটা বুকভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন অনিকে পলকে আত্মহারা করিয়া দিয়াছিল। একসঙ্গে তাহার স্নেহ, মায়া, মমতা—কোমলতার যাবতীয় সম্পদ যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল। হায় পুরুষ! তোমার কর্ম্মশ্রান্ত জীবনকে তুমি নিজশক্তিতে সজীব করিয়া রাখিতে পার না। তুমি অদম্য উৎসাহে অগ্রসর হইয়া যাও; উৎসাহ তোমার কর্ম্মকেই বাঁচাইয়া রাখে। কিন্তু তোমার সেই ক্লান্ত ও রুক্ষ উৎসাহকে যে সজীব করিয়া রাখে সে তোমার মাতা, পত্নী, ভগিনী ও কন্যা—তাঁহাদেরই সেই স্নিগ্ধতার শান্তি-ধারায় স্নান করাইয়া। সে যে প্রকৃতির নিয়ম,—দেবতার দান।

রাত্রিদিন মেজরের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অনি তাঁহার সেবা করিতেছিল; সে সেবায় ক্লান্তি ছিলনা, অবসাদ ছিলনা। মেজরের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া অনি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছিল; কিন্তু সেবার তৃপ্তিতে সে প্রীত হইতে পারে নাই। মেজরের

নিকট সে ঋণী ছিল সত্য। কিন্তু তিনি প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখিতেন না, তাঁহাকে দিবার মত অনিরও কোনো সম্বল ছিল না; তাই সে-মহাজনের ঋণভার অনি সাধ্যমত লাঘব করিতে চাহিয়াছিল, তাঁহার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়া। তবে তাঁহার রোগ-শয্যা-পাশে এই নির্ম্মম সেবার সুযোগ অনি কখনই চাহে নাই। ঠাকুর! সে আমরণ ঋণী হইয়া থাকিবে, তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই। তুমি মহৎকে মহাপ্রাণ দিয়াছ, হৃদয় দিয়াছ, শক্তি দিয়াছ,—বিপন্নকে সাহায্য করিবার জন্য। যে নিরুপায় তাহাকে সাহায্য গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়াছ তুমি; প্রতিদানের অক্ষমতাও দিয়াছ তুমি। এইরূপে প্রতিদানের সুযোগ দিয়া অক্ষমকে আর বিপন্ন করিয়া তুলিও না প্রভু! যদি সে অধিকার পাই, আবার জন্মান্তরে ফিরিয়া আসিব। আমার মূল্যহীন জীবনের সবটুকু পরমায়ু নিঃশেষে লইয়া, মেজরের জীবনকে সুদীর্ঘ করিয়া দাও; তাঁহাকে ভাল কর!

অনি লক্ষ্য করিয়াছিল—মেজর সে-দিন অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে কাহার নাম করিয়া কলিকাতায় একটা সংবাদ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; কিন্তু মেজর আর কোন উত্তর দেন নাই। সে বুঝিয়াছিল: মেজর ইচ্ছা করিয়াই সেটা গোপন করিয়া গেলেন। মেজর যেটাকে গোপন করিতে চান, অনি তাহা লইয়া আর পীড়াপীড়ি করিল না।

* * * *

অনাহার, অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তায় অনির স্বভাব-কমনীয় মুখখানি যেন এই কয়েক দিনের মধ্যেই মলিন হইয়া গিয়াছিল। তাহার

চোখে বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতার সে দীপ্তি আর ছিল না; এই দশ-বারো দিনের প্রাণপাত পরিশ্রম ও মানসিক উদ্বেগে তাহা নিষ্প্রভ হইয়া উঠিয়াছিল।

সেদিন বনবিহারীবাবু অনির আকস্মিক পরিবর্ত্তনটুকু লক্ষ্য করিয়া, বিশেষ দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"অণিমা দেবী, শরীরের প্রতি এতখানি অবহেলা করা কি আপনার উচিত হ'চ্ছে? এর 'পর আপনিও যদি বিছানা নেন, তখন উপায়টা কি হবে ভাবুন দেখি!"

অনি শুষ্ক একটু হাসিয়া উত্তর দিল "ক্যাপ্টেন্, মানুষের চিকিৎসা করা আপনাদের ব্যবসা; সুতরাং তাদের শরীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনাদের যথেষ্টই জ্ঞান থাকা উচিত,—উচিত কেন! তা আছেই। কিন্তু তাই ব'লে ব্যবহারিক-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও যে আপনাদের বিশেষ পারদর্শিতা আছে—তা মনে হয় না।"

বনবিহারীবাবু সহসা এরূপ একটা অসংলগ্ন উত্তরের কোন তাৎপর্য্যই বুঝিলেন না। তিনি যেন কতকটা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াই অনির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার মানে?"

অনি পুনরায় হাসিয়া বলিল—"মানে অত্যন্ত সহজ ও সরল। শরীরের সম্বন্ধে আপনাদের বিজ্ঞানে যা'-সব লেখা আছে, তার একটাও মিথ্যে নয়। কিন্তু যাদের ওপর সেগুলোকে খাটাতে চান, তাদের নিজের নিজের সাধারণ সূত্র খুব গোলমেলে হ'তে পারে!"

"পার্ডন্, আপনার কথাটা এখনো ঠিক বুঝ্‌লুম না।"

অনি অপেক্ষাকৃত ধীরস্বরে বলিল—"আমি স্বীকার ক'রে নিচ্ছি যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মানুষের শরীর-রক্ষা সম্বন্ধে যে সব সূত্র লিখে গেছেন, সেগুলো সম্পূর্ণ সত্য; তবে সেই সব সূত্র অমানুষের

পক্ষেও খাটবে কি না, সেটা সন্দেহজনক। ব্যবহারিক জীবনে মানুষের মধ্যে এত রকমারি স্বভাব গড়ে' উঠেছে, যার জন্যে পুঁথির সূত্রগুলো ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে খাটে না। আপনি স্বীকার ক'রবেন নিশ্চয়ই যে, আগুনের তাপে মুখ ঝল্‌সে যায়। কিন্তু অনবরত হাপরের পাশে থেকে আগুনের তাপ যার সহ্য হ'য়ে গেছে, তার মুখ কি আর আগুন-তাপে ঝল্‌সাবে?"

বনবিহারীবাবু কথাটা বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে না পারিয়া, একটু বিরক্তির সঙ্গেই কহিলেন—"ও-সব বাজে কথা ছেড়ে দিন। সময়ে নাওয়া-খাওয়া সব ছেড়ে দিয়ে, শরীরটাকে কি ক'রে ফেলেছেন, দেখ্‌ছেন কি? এত কষ্ট ক'রবার কোনো দরকারই বুঝি না। একটা নার্স কয়েক দিনের জন্যে ঠিক ক'রলে, আপনারও কোন কষ্ট হ'ত না, মেজরের সেবা-যত্নও বেশ ভালই হ'ত। অবশ্য আপনি যে রকম রোগীর যত্ন করেন, তা' নার্সরাও সব সময় পেরে ওঠে না; কিন্তু তাই ব'লে আপনার নিজের শরীরটা সম্বন্ধে এমন উদাসীন হ'য়েও লাভ নেই।"

"নিজের শরীর তো সব সময়ই দেখ্‌ছি বনবিহারীবাবু! ওতে আমার কোন কষ্টই হয় না; ওটা আমাদের শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। স্বাভাবিক ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘ'ট্‌লে, অসুস্থতা ও অশান্তি এসে প'ড়তে পারে। কিন্তু তার স্বাভাবিকত্ব একটু-আধটু কম-বেশী হ'লে কিছু ক্ষতি হ'তে পারে কি? সেবাই হ'চ্ছে নারীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেবার জন্যে আমরা জন্মেছি, সেবাতেই আমাদের সার্থকতা। অন্ততঃ যে সমাজ ও জাতীয়তার আদর্শে আমাদের জীবন গড়ে' ওঠে, সেখানে সেবার চেয়ে বড় কোন আদর্শ-ই মেয়েদের নেই।

৩৬

বনবিহারীবাবু কিছুদিনের পরিচয়েই অনিকে বিশেষ-ভাবে চিনিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন—অনি যেটাকে ধরিবে, তাহা হইতে সহজে তাহাকে সরানো যায় না। তবুও তিনি অনির এই প্রকার যুক্তি সমর্থন করিতে পারিলেন না; বেশ একটু অসন্তুষ্টির সঙ্গেই বলিলেন—

"আদর্শ নিয়ে বেঁচে থাকবার যুগ আর নেই অণিমা দেবী! নারীও মানুষ; তারও রক্ত-মাংস, সুখ-দুঃখ সবই আছে। সমাজের ভিতর নারীর যে আদর্শকে খাড়া ক'রে রাখা হ'যেছে, সেটা কেবলমাত্র সর্ব্বতোভাবে নারীর উপর পুরুষদের কর্তৃত্বটাকে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার মতলবে—বুঝ্‌লেন! সেটা যতদিন না ধরা পড়েছিল, ততদিন তার মূল্য ছিল। আজ আর সেটাকে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। সভ্য-দুনিয়ার দরবারে স্বার্থ-পিশাচরা তাদের সে দাবী এখন হারিয়েছে। আপনি শিক্ষিতা হ'য়েও যে সেই সব গোঁড়ামির হাত থেকে মুক্ত হ'তে পারেন নি, এটা বড়ই দুঃখের কথা। নিজেকে অত ছোট ক'রে দেখ্‌বেন না।"

"নিজেকে ছোট ক'রে দেখাটাই বড়, না—বড় ক'রে দেখাটাই বড়,—সেটা আমার চেয়ে আপনিই ভালো জানেন। সেই কূটনীতির তথ্য আবিষ্কার ক'রে, আপনাদের সভ্য-জগৎ হয় তো নারীকে তার ছোট আসন থেকে টেনে তুলে' বড় আসনের পাশে সমান অধিকারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু তাই ব'লে তাদের স্বাভাবিক ধর্ম্মকেও উল্‌টে দিয়ে তাতে সমান দাবী সাব্যস্ত ক'রতে পেরেছেন কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্টই সন্দেহ আছে। প্রকৃতির কাছ থেকে যে যা পেয়েছে, সেটার উপর 'ছোট-বড়'র সমস্যা এসে কোন পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে কি? নারীর মাতৃত্ব,

স্নেহ, মায়া, মমতা, দুর্ব্বলতা—এগুলো থাক্‌বেই। তবে আপনাদের সভ্য-দুনিয়ার 'কৃত্রিম উপায়' তার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাবে কি না, ব'ল্‌তে পারি না। যাক, ওই নিয়ে তর্ক ক'রবার সময় এখন নয়, আমার সে ইচ্ছাও নেই। আপনি যদি বোঝেন যে রোগীর শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হ'চ্ছে, নার্স নিযুক্ত করুন; তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে—সেবা কিন্‌তে মেলে না।"

অনি আর কোন কথা না বলিয়া গম্ভীরভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণে কথাটার আগাগোড়া ভাবিয়া দেখিতে গিয়া সে মনে মনে বেশ একটু লজ্জিতা হইল। মেজরের শুশ্রূষার কথা লইয়া তাহার এরূপ কোন তর্ক না করাই ভাল ছিল;—বনবিহারীবাবু কি ভাবিবেন! সত্যই তো, প্রয়োজন হইলে ডাক্তার নার্স নিযুক্ত করিবেন; তাহাতে বনবিহারীবাবুর প্রতি অকারণ বিরক্তি ও নার্সদের সেবার উপর অযথা এরূপ অবজ্ঞার ভাব আসিবার কোন কারণ নাই। অনির নিজেরই মনে হইল—সে যেন নার্সদের সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষোক্তি করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু এরূপ বিদ্বেষভাব আসিবার কোন কারণ তো তাহার জীবনে ঘটে নাই। আর মেজরের সেবার ভার বিন্দুমাত্র ছাড়িয়া দিবার কথাতেই বা তাহার প্রাণে এ আঘাত লাগে কেন?

অনির অন্তর লজ্জায় রাঙিয়া উঠিল।

বনবিহারীবাবু তখন বাহিরের বারান্দায় বসিয়া অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিলেন এই নারীর প্রকৃতির কথা। অনিকে যেন তিনি চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছিলেন না। অনির শিক্ষা, স্বভাব ও ব্যবহার—সবই সৌম্য-সুন্দর রূপের কোমলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ফুটিয়া উঠে। গৌরাঙ্গী না হইলেও, তাহার অত্যুজ্জ্বল

শ্যামবর্ণের ভিতর এমন একটা দীপ্তি অথচ সুকুমার সজীব সৌন্দর্য্য আছে, যাহাতে তাহাকে একটী তৃণশ্যামল ছায়াকুঞ্জ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সে স্নিগ্ধতার অন্তরের বিরাট তেজস্বিতা দেখিলে মনে হয়—সে যেন একটা ভীষণ আগ্নেয়গিরি। বাহিরের প্রকৃতি শ্যামল, কিন্তু অন্তর তেজস্বিতার বহ্নিশিখায় প্রদীপ্ত।

নিজের ত্রুটিটুকু ঢাকিয়া লইবার জন্য অনি তাড়াতাড়ি বনবিহারীবাবুর উদ্দেশে ফিরিয়া আসিতেছিল। অনির ধারণা হইয়াছিল—বনবিহারীবাবু বোধ হয় তাহার বাচালতায় একটু অপ্রীত হইয়াছেন। কিন্তু বারান্দার সম্মুখ পর্য্যন্ত আসিয়াই সেই নির্ব্বিকার কাব্য-মাতালের ভাবটুকু চোখে পড়িতে, অনির সে ধারণা কাটিয়া গেল; সে অনেকখানি সোয়াস্তি অনুভব করিল। বনবিহারীবাবু তখন আপন মনে মাথা দোলাইয়া তুড়ি দিতে দিতে আবৃত্তি করিতেছিলেন—

রে চপলা, হাস্য যে তোর
স্নিগ্ধ আলোক মাখা!
গোপন বুকের অন্তরালে,
প্রলয় তেজের বহ্নি জ্বলে:
প্রাণ কাঁপানো সুরের আগুন
ঘুমের নেশায় ঢাকা॥

অনির অক্লান্ত সেবা ও বনবিহারীবাবুর সযত্ন চিকিৎসায় মেজর উনিশ দিন রোগ-ভোগের পর উঠিয়া বসিলেন। মেজরের রোগ-মুক্তিতে অনির মন একটা অপূর্ব্ব শান্তি ও তৃপ্তির আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার চিরব্যর্থ সেবা যে সার্থক হইবে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। কিন্তু অনির এই মানসিক শান্তি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। মেজর সারিয়া উঠিলেন; নিজের কর্ত্তব্যের দিক দিয়া অনি এতদিন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু এখন তো আর নিশ্চেষ্ট ভাবে মেজরের স্কন্ধে ভর করিয়া তাহার বসিয়া থাকা চলে না; জীবন-সংগ্রামে তাহাকে নামিয়া পড়িতেই হইবে। যাঁহার নিকট সহস্ররূপে ঋণী হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার ঋণভার আর সে কত বাড়াইতে পারে! অনি জীবিকা অর্জ্জনের একটা পথ খুঁজিয়া লইবার জন্য ভিতরে ভিতরে সচেষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। দাতার হস্ত চির-মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট গ্রহীতার সে দান গ্রহণে অবাধ-হস্ত হওয়াকে অনি যেন অন্তরের সহিত সমর্থন করিতে পারিতেছিল না। বন্ধুত্বের দাবীরও একটা সীমা আছে।

* * * *

সন্ধ্যার পর মেজরকে ঔষধ খাওয়াইয়া অনি পড়ার ঘরে আসিয়া বসিল। মেজরের অসুখের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া, আজ প্রায় তিন সপ্তাহেরও অধিক অনি তাহার পড়ার ঘরে আসে নাই। টেবিল ও আলমারির চারিদিকে ধূলা জমিয়া উঠিয়াছে; এ মাসের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি যে অবস্থায় আসিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই এখনো পড়িয়া আছে।

৪০

লাইব্রেরী-ঘরের অবস্থা দেখিয়া, অনির মনে হইল ইহার পূর্ব্ব-অবস্থার কথা! যেদিন সে প্রথম আসিয়া এই ঘরখানির সহিত পরিচিত হইয়াছিল, সে দিন যে অবস্থায় ইহাকে দেখিয়াছিল—আজকার অবস্থার সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন পার্থক্যই নাই। তবে সাময়িক-পত্র ও বইএর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। অনির অবসর সময়ের খোরাক যোগাইবার জন্যই মেজর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ইহার পুষ্টি সাধন করিতেছিলেন। সে কথা তিনি না স্বীকার করিলেও, অনির বুঝিতে কণামাত্র বাকী ছিল না। সরঞ্জাম বজায় রাখিলেও লাইব্রেরীর সহিত সম্পর্ক রাখিবার অবসর মেজরের খুব কমই হইত।

অনির শরীরটা অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তখন আর ঘরের সংস্কার করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। খবরের কাগজখানা হাতে করিয়া, খোলা জানালার পাশে চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া অনি বসিয়া পড়িল। দেশ-বিদেশের সংবাদ দেখিবার প্রবৃত্তি তখন তাহার ছিল না; নিজের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় সে অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। যে-কোন একটা উপায় তাহাকে অবলম্বন করিতেই হইবে। মেজর যাহাই বলুন—তাঁহার সাহায্যে—তাঁহারই ভাগ্যোপজীবী হইয়া আর অনি বাস করিতে পারিবে না; তিনি নিঃসম্পর্কীয়। অনিরও সমাজ আছে, মেজরেরও সমাজ আছে; সে সমাজ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও সমাজ; তাহার বিধি-ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেই হইবে। বন্ধুত্বের দাবী যতই পবিত্র হউক; সে নারী—মেজর পুরুষ! সমাজ এ দাবী কখনই সমর্থন করিবে না। লোকালয়ে বাস করিতে হইলে লোকমতকে মানিতেই হইবে।

অনি বাসয়া বসিয়া 'কর্ম্মখালি'র ছত্রগুলির ভিতর তাহার কর্ম্মজীবনের উপায় খুঁজিতেছিল। কত দূর-দেশের বিভিন্ন আহ্বান বহিয়া সংবাদপত্র কর্ম্মপ্রার্থীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অভাবের তাড়নায় মানুষ ছুটিয়া বাহির হইবে, এই আহ্বানে তাহার ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনকে ছাড়িয়া সেই সুদূর প্রবাসের পথে। এই অভাব স্নেহের ধার ধারে না; বন্ধুত্বের সহানুভূতিকে মুছিয়া ফেলে। অদৃষ্টের অন্বেষণে গৃহীকে উদাস করিয়া বাহির করে। তাহাকেও বাহির হইয়া পড়িতে হইবে—নিজের জীবিকার সন্ধানে—ঐ একই পথে। তবে তাহার আকর্ষণের বালাই নাই; সমস্ত বাঁধন আপনা-আপনিই ছিঁড়িয়া পথ পরিষ্কার হইয়াছে।

আবার আশ্রয় ছাড়িয়া বাহির হইবার কথা ভাবিতে ভাবিতে অনির চক্ষু দুইটী ভারি হইয়া আসিল। এই দুই-তিন মাসের ঘনিষ্ঠতায় এখানকার সবই যেন নূতন করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে; এই ঘর-বাড়ী, মেজরের এই মহৎ ও সুদৃঢ় আশ্রয়। মেজরের স্নেহ ও সহানুভূতির কথা মনে হইতেই সহসা অনি একটা অনাস্বাদিত আনন্দ ও ভীতিতে শিহরিয়া উঠিল। এ শিহরণ সে জীবনে কখনো অনুভব করে নাই। একটা অজ্ঞাত আনন্দের রঙীন তুলি অলক্ষ্যে তাহার সমস্ত বুকের ভিতর কে যেন টানিয়া দিল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আতঙ্কের কালো ছায়া সেই গোলাপী-আভায়-রঙানো চিত্তপটকে গাঢ় মসির প্রলেপে ভরিয়া দিল! অনি ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল; মনের তীব্র শাসন নিমেষে তাহার সমস্ত আনন্দকে লাঞ্ছিত করিয়া তুলিল। খবরের কাগজখানিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অনি দৃঢ়মুষ্টিতে জানালার

গরাদে ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অকারণ-বিহ্বলতার উদ্গত অশ্রুকে রোধ করিবার জন্য, ওষ্ঠ-দুইটীকে দাঁতে চাপিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল। কাল-বৈশাখীর প্রচণ্ড মেঘ পাগল হাওয়ার সঙ্গে মাতামাতি করিয়া তখন সমস্ত প্রকৃতিকে কাঁপাইয়া ফিরিতেছিল। চকিত দৃষ্টিতে অনি আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল; সে যেন তাহারই বুকের একটা প্রতিচ্ছবি! দূরে অন্ধকারের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের যে উজ্জ্বল রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নিমেষে আবার গাঢ় কালিমায় মিলাইয়া গিয়াছে।

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে অনির মনটা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। যখন বয় আসিয়া জানাইল, সাহেবের দুধ ও রুটী গরম করা হইয়াছে, অনি মুখ না ফিরাইয়াই নীরস আদেশের স্বরে তাহাকে বলিয়া দিল মেজরকে খাওয়াইবার জন্য। অনির এরূপ গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বয় আর কোন কথা বলিবার সাহস পাইল না; সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অনি অবসন্নভাবে মাটির উপর বসিয়া পড়িল। আজ আর মেজরকে খাওয়াইবার জন্য সে উঠিল না। একটা প্রশ্ন কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনির মনে উঠিতেছিল—'মেজর-সাহেব—ক্রিশ্চান্! না ব্রাহ্ম?'

শিক্ষিত হইয়াও যাহারা নিজের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া নূতন সম্প্রদায় গঠনে যোগদান করে, নিজের জন্মগত জাতীয়তার গৌরবকে মাথায় লইয়া যাহারা পৃথিবীতে দাঁড়াইতে পারে না, অনি তাহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারে না। কিন্তু মেজরের বিষয়ে তাহার সে দৃঢ়তা যেন আপনা-আপনি

শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। তাহার দৃঢ়চিত্ত দাদামশায়ও মেজরের এই দুর্ব্বলতাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে স্নেহের চক্ষেই দেখিয়াছিলেন।

কোনো একটা সূত্র লইয়া অনি যখনই মেজরের কথা ভাবিত, তখনই তাহার মনের মধ্যে একটা অচেনা দম্‌কা হাওয়া আসিয়া চিন্তার সমস্ত সূত্রগুলিকে ওলট্‌-পালট্‌ করিয়া জট পাকাইয়া তুলিত। অনি কোনোরূপেই সে বিশৃঙ্খলতার সমাধান করিতে পারিত না। আজও নিজের ভবিষ্য-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মেজরের কথা ভাবিতে গিয়া অনি সেই জটিলতার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। নিষ্কৃতির পথ খুঁজিতে গিয়া আজ শুধু দাদা-মশায়ের শেষ কথাটীই তাহার বারে বারে মনে পড়িতেছিল। তাহার হাত দুইটী ধরিয়া নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া দাদু বলিয়াছিলেন—"দিদিমণি, সমাজ আর শাসনের দরকার মানুষের সম্পদকে নিরাপদ ক'রে রাখবার জন্যে। বিপন্ন যদি সম্পদের কোনো আশ্রয় পাবার আশায় সেই সমাজের একটা গণ্ডীকে ভেঙে ফেলে, তাতে পাপ হয় না। নিরূপিত বিধি কিংবা আইনের একটা সূত্র লঙ্ঘন করা হ'লেও, সেই বিধির উদ্দেশ্যকেই তার দ্বারা ভাল ক'রে সমর্থন করা হয় দিদি! সমাজ অনুমতি না দিলেও—তোমার দাদুর আদেশ থাকলো।"

দাদুকে যথেষ্ট ভক্তি ও মেজরকে শ্রদ্ধা করিলেও অনি তাহার দাদুর শেষ উপদেশটী এতদিন কোনরূপেই মাথা পাতিয়া লইতে পারে নাই। আজ মেজরের আশ্রয় ছাড়িয়া যাইবার কথা মনে হইতেই অনি সহসা নিজের বুকের ভিতর যে দুর্ব্বলতার ক্ষত দেখিতে পাইল—তাহাতে তাহার নিঃসম্বল চিত্ত আর্ত্তনাদ করিয়া

উঠিল। অনি সে দুর্ব্বলতাকে প্রাণপণ চেষ্টাতেও দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিল না। দৃঢ়তার নিষ্ঠুর শাসনে তাহার ক্ষতমুখ হইতে যে রক্তস্রোত ছুটিল, তাহার একমাত্র প্রলেপ সে খুঁজিয়া পাইল দাদুর ঐ কয়েকটী কথার ভিতর। তবুও অনি স্থির হইয়া ভাবিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—সেটা দাদুর সত্যকার আদেশ, না—স্নেহের কাছে পরাজয় স্বীকার!

* * * *

অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে বসিয়া থাকার পর, সহসা খেয়াল হইতেই অনি চাহিয়া দেখিল—খোলা জানালাপথে বৃষ্টির ছাট্ আসিয়া সব ভিজিয়া গিয়াছে। মেজরের ঘরের জানালা তখনও বন্ধ করা হয় নাই, সে কথা মনে হইতেই অনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার ঘরে গেল।

* * * *

মেজর সমস্ত জানালা দরজা আরও ভালরূপে খুলিয়া দিয়া সোফার উপরে চোখ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছেন। দুধ ও পাঁউরুটি টিপয়ের উপর ঠাণ্ডা হইয়া পড়িয়া আছে। অনি বুঝিল—মেজর সচেতন, কিন্তু ডাকিয়া কোন সাড়া পাইল না।

মেজরের এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমানের সহিত অনি পূর্ব্ব হইতেই পরিচিতা ছিল। মেজর তাঁহার জীবনের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তকে সেই সাময়িক বিশিষ্টতা মাত্র লইয়াই বিচার করিয়া দেখিতেন। জীবনের পশ্চাৎ ও সম্মুখের দিকে চাহিয়া চলিবার ধৈর্য্য তাঁহার কখনই ছিল না। এক একটা মুহূর্ত্তের তীব্র খেয়াল তাঁহার সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎকে ছাপাইয়া উঠিত। মেজরের এইরূপ সাময়িক উত্তেজনাগুলিকে অনি উত্তমরূপে চিনিয়াছিল বলিয়াই,

দ্বিতীয় কোন চেষ্টা না করিয়া, গ্রীন্ শেডে আলোটী ঢাকিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনি যেন ইচ্ছা করিয়াই তাহার সঙ্কোচের উন্মুক্ত রশ্মিকে আবার ধীরে ধীরে টানিয়া গতি ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মনের ভাঙা-চূরা অবস্থাগুলিকে আবার গুছাইয়া তুলিতে গিয়া এবার অনির চোখে তাহার নিজের ত্রুটিটুকুও বেশ স্পষ্টই ধরা পড়িয়া গেল; তাহার নিজেরই অন্তরে—ঘুমন্ত এক টুক্‌রা মৌন কামনা।

মেজরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবার জন্য অনি ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

৮

বনবিহারীবাবুর একান্ত অনুরোধে সেদিন সন্ধ্যায় অনি ও মেজর তাঁহার প্রবাস-কুটীরে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য উপস্থিত না হইয়া পারিলেন না। এ নিমন্ত্রণে মেজর বিশেষ প্রীত না হইলেও, অনি আনন্দিত হইয়াছিল। সে তাহার দুশ্চিন্তা-পীড়িত অবসরে এইরূপ একটা অবলম্বনই কয়েকদিন হইতে খুঁজিতেছিল।

বনবিহারীবাবুর সঙ্গে অনির এতখানি মেলা-মেশা যেন মেজরের ভাল লাগিতেছিল না, অথচ মেজরের অপ্রীতির কোন কারণই ছিল না। কিন্তু তাঁহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য সর্ব্বদার জন্য এরূপ একটা হেঁয়ালি করিয়া তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিত, যাহাতে তাঁহার অন্তরের ক্ষুদ্র ভাবও বহির্জগতের চক্ষে একটা অকারণ গুরুত্ব লইয়া চলিত। যাহারা অস্বাভাবিকরূপে গম্ভীর, তাহাদের

ছদ্ম আবরণ সহজে ভেদ করা যায় না বলিয়াই, মানুষ তাহাদের নিতান্ত মূল্যহীন উপাদানগুলিকেও সমীহ করিয়া চলে।

*　　*　　*　　*

ষ্টেশনের কিছুদূরে—প্রকাণ্ড খালটার পাশে, ছোটবড় নিমগাছের সারির আড়ালে ঢাকা, বনবিহারীবাবুর মস্ত বাংলো ও রেলকর্ম্মচারিদের ছোট ছোট কয়েকটা একতলা বাসা। পুরানো লাইনের রেলগুলিকে তুলিয়া দিয়া, পাথর ও পোড়া-কয়লা পিটাইয়া, তাহাকেই রাস্তা করা হইয়াছে। বিশ বৎসরের সঞ্চিত পাথর-কুচি ও রাশি রাশি ছাই সর্ব্বত্রই এরূপ কায়েমী স্বত্বে জমিয়া বসিয়াছে যে, সমস্ত পল্লীটি একবারে মরুভূমির মত শুষ্ক ও নীরস হইয়া উঠিয়াছে।

বহু যত্নে এই নির্ম্মম মাটির বুকে উর্ব্বরতা সঞ্চার করিয়া বনবিহারীবাবু তাঁহার বাংলো-সংলগ্ন ময়দানটীতে ছোট্ট একখানি সুন্দর বাগান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। চারিদিকে লোহার রেলিংএ ঘেরা; মাঝে মাঝে দেবদারু ও ইউক্যালিপ্টাস্ মাথা তুলিয়া আছে; তাহারি মাঝে অজস্র এব্রিকট্ ও সিজ্‌নের ফোটা ফুলগুলি বাড়ীখানিকে যেন একটি সুন্দর কবিতার মত সাজাইয়া রাখিয়াছে।

ছুরি আর আইডিনের ভিতর দিয়াও যে ক্যাপ্টেন্ তাঁহার কাব্য-রুচিকে সজীব করিয়া রাখিয়াছেন, তজ্জন্য অনি তাঁহাকে সহস্রধার ধন্যবাদ জানাইল।

সন্ধ্যার পর মেজর, অনি, বনবিহারীবাবু ও তাঁহার পত্নী সুলতা বাগানের মার্ব্বেল বেদীটির উপর বসিয়া গল্প জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। সুদূর প্রবাসে অপরিচিতের ভিড়ের মাঝখানে

সহসা স্বদেশীকে খুঁজিয়া পাইলে, মানুষ যেরূপ অপ্রত্যাশিত আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, সুলতাকে পাইয়া অনিও সেইরূপ একটা অপূর্ব্ব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সুলতার সহিত নানা গল্পে অনি এতই মাতিয়া গিয়াছিল যে, মেজর ও বনবিহারীবাবুর কথায় যোগ দিবার অবসর তাহার ছিল না।

রাত্রি হইতেছে দেখিয়া বনবিহারীবাবু বয়কে ডাকিয়া সকলের খাবার ঠিক করিয়া দিতে বলিলেন। হঠাৎ সকলের খাবার কথা শুনিয়াই অনির চমক্ ভাঙিয়া গেল। তাড়াতাড়ি বনবিহারীবাবুর দিকে ফিরিয়া, তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, অনি বিশেষ লজ্জিতা হইয়া কহিল—"মাপ ক'রবেন, ক্যাপ্টেন্! আমি পূর্ব্বে ব'ল্‌তে ভুলে গেছি। আমার তো—"

বনবিহারীবাবু জানিতেন—অনির কতকগুলি সংস্কার আছে। কিন্তু সেই সংস্কারের দড়ি যে এখনো তাহার নাকে-কাণে টান দিয়া রাখিয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়াই কহিলেন—"সে কি কথা! সংস্কারের মোহ আপনার এখনো কাটে নি? তা হ'তেই পারে না; গরীবের কুটীরে যখন দয়া ক'রে পদার্পণ ক'রেছেন, তখন অন্ততঃ আজকার মত ও-সংস্কারটাকে ছাড়্‌তেই হবে। যা হোক্ একটু কিছু মুখে না দিলে চল্‌বে না অণিমা দেবী।"

অনি হাতজোড় করিয়া বলিল—"ক্ষমা করুন ডাক্তারবাবু, যা এতদিনেও মন থেকে দূর ক'রতে পারি নি, জোর ক'রে তাকে ঝেড়ে ফেল্‌বার ক্ষমতা আমার নেই। তবে এ কথা আমি সর্ব্বান্তঃ-করণে স্বীকার ক'রে যাচ্ছি যে, আমার তরফ্ থেকে আপনার আতিথেয়তার কোন ত্রুটিই পাই নি। আমি না খেয়েও

আজ যে তৃপ্তি ও আনন্দ পেলুম, খেয়ে তার চেয়ে বেশী কখনই পেতুম না।”

বনবিহারীবাবু বুঝিলেন—ইহা অনির একটা ছদ্ম মাত্র। এইখানেই যে তাহার একটা প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা আছে তাহা তিনি জানিতেন। মানুষকে জয় করিবার প্রশস্ত উপায় তাহার দুর্ব্বলতাকে আক্রমণ করা। সেদিন চেষ্টা করিয়াও বনবিহারীবাবু অনিকে হার মানাইতে পারেন নাই; কিন্তু সেই দুর্ব্বলতাকে পুনরাক্রমণ করিবার লোভ তাঁহার যথেষ্টই ছিল। যাহাকে সহজে আঁটিয়া উঠা যায় না, দুর্ব্বলতার অবসর লইয়া তাহাকে বিব্রত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে তিনি ত্রুটি করিতেন না। বনবিহারীবাবু বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন—

“দুনিয়ায় শুধু নিজের তরফের তৃপ্তিটা সর্ব্বদা দেখ্‌লেই চলে না; পরের তরফ্ ব'লেও একটা জিনিষ আছে। মাপ ক'র্‌বেন; আপনাদের এই যে সংকীর্ণতা—যা শুধু নিজের তরফ্‌টাকেই দেখ্‌তে শিখিয়েছে—তার মূল কারণ ঐ কুসংস্কারের পচা আবর্জ্জনা। ওই আবর্জ্জনাই আমাদের সমাজ, দেশ ও জাতীয়তার সব গৌরবকে পঙ্কিল ক'রে তুলেছে। এইটাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই সমস্ত আবর্জ্জনাগুলোকে ঝেড়ে ফেলে, ভিতরটাকে পরিষ্কার ক'রে উঠ্‌তে পারে নি। ঐ সব বাজে পিছু-টান,—না আছে তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, না আছে কোনো বাস্তব মূল্য—বেড়াজালের মত ঘিরে ঘিরে দেশটাকে উচ্ছন্নের পথে টেনে নিয়ে গেছে,—জাতিটাকে অধঃপতনের চরম সীমায় এনে দাঁড় করিয়েছে। এ বাঁধন যতদিন না ছিঁড়্‌বে,

ততদিন বিশ্বমানবের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। শিক্ষা পেয়েও যাদের সে জ্ঞান হয় না, তাদের শিক্ষার কোন মূল্যই নেই।"

বনবিহারীবাবুর কথার মধ্যে যে উষ্ণতা ছিল, তাহা উপলব্ধি করিলেও অনি বেশ ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে বলিল—"ওই নিয়ে তর্ক ক'র্‌বার ইচ্ছা আমার নেই, ক্যাপ্টেন্! জীবনের পথে যার যা ভাল লাগে সে তাই নিয়ে চ'লবে; তাতে সমালোচনার কিছু নেই। তবে মূর্খ যে-ভুলটা ক'রে চ'লছে—আপনারাও যে সেই ভুলটাকে এড়িয়ে চ'লবার চেষ্টায় কেন নতুন ভুলে জড়িয়ে যাচ্ছেন, সেইটা আমি বুঝ্‌তে পা'রছি না?"

অনির কথাটা বুঝিতে না পারিয়া, বনবিহারীবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"অর্থাৎ?"

সুরটাকে আরও একটু তরল করিয়া লইয়া, অনি হাসিয়া বলিল—"ডাক্তারবাবু, একটা বিধিবদ্ধ সামাজিক রীতিকে মেনে চলাই যদি সংস্কার হয়, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে সেই সব সংস্কারকে অবিচারিত ভাবে শুধু 'সংস্কার' ব'লেই বাদ দিয়ে ও ঘৃণা ক'রে চ'লবার বিধিবদ্ধ রীতিটাও কি সংস্কার নয়? সংস্কার হ'লেই কি সেটাকে ঘৃণা ক'রতে হবে? বিশেষতঃ আপনি যাকে সংস্কার বলেন—তা যে দুনিয়ায় নেই কোন্ জাতির, তা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি না।"

অনির কথায় বাধা দিয়া বনবিহারীবাবু বলিলেন—"তা ব'লবেন না অণিমা দেবী। দুনিয়ার সভ্য জাতিদের যদিও কোনো সংস্কার থাকে, তবে সে সংস্কারের নিশ্চয় কোনো একটা বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে। নিছক গোঁড়ামি যাকে বলে, তা তাদের নেই।"

ধীরভাবেই অনি বলিয়া চলিল—"তা নয় ক্যাপ্টেন্, সকল জাতিরই এমন অনেক সংস্কার আছে, যার বৈজ্ঞানিক মূল্য মিলবে না। তবুও সে সব তারা মানে; সে বিষয়ে অল্প-বিস্তর গোঁড়ামিও তাদের আছে। আর তাই তাদের জাতীয়তার এক একটা অঙ্গ। যাক্, সেদিন এই নিয়ে তো আপনার সঙ্গে অনেক কথাই হয়েছে। আপনি যখন মান্‌বেনই না, তখন ওই নিয়ে আর আপনার সঙ্গে তর্ক করা মিছে।" ঈষৎ হাসিয়া অনি বনবিহারীবাবুর পানে চাহিল।

বনবিহারীবাবু বোধ হয় তাহাতে আরও একটু জ্বলিয়া উঠিয়া বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু অনি তাড়াতাড়ি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"আর আপনি যে ব'লছিলেন—'ভিত্তিহীন সংস্কারগুলোই জাতির উন্নতির পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে; বিশ্ব-প্রেম ক'রবার মত আমাদের অন্তরকে প্রশস্ত হ'য়ে উঠ্‌তে দিচ্ছে না।' সেটা মস্ত ভুল। ঐ আবর্জ্জনাই আমাদের পথরোধ ক'রছে, না—তাকে না-জেনে না-চিনে, আবর্জ্জনা ব'লে ঘৃণা ক'রবার সঙ্কীর্ণতা আমাদের উন্নতির বাধা তা ঠিক বলা যায় না। আমার মনে হয়, 'নিজস্ব'কে অবহেলা ক'রে, 'পরস্ব'কে পূজো ক'রবার কাপুরুষতাই আমাদের পিছিয়ে রেখেছে। যে মা-ভাইকে ভালবাসতে পারে না, তার পক্ষে বিশ্ব-সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রবার ইচ্ছাটা নিতান্ত বাতুলতা নয় কি? জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিয়েই অবস্থা তাই ঘটে;—সিঁড়ি ভেঙে ফেলে চারতলায় উঠ্‌বার পথ পরিষ্কার করার মত। কবি-কল্পনার বিশ্ব-প্রেম আর বাস্তব বিশ্ব-প্রেমে অনেক তফাৎ। নিজস্বকেই ব্যাপ্ত ক'রে

নিয়ে পরস্বের সঙ্গে মিল খাওয়াতে হবে; ছেঁটে ফেলে নয়, বুঝলেন ?"

"তা' কথনই হ'তে পারে না অণিমা দেবী। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিকে যদি মূল্যহীন ব'লে বুঝতে পারি, তবে সেটাকে ত্যাগ ক'রতেই হবে। যা মেনে চলে' এতকাল কোন লাভই হয় নি, সেটা যে কেবলমাত্র ভার হ'য়ে আমাদের ঘাড়ে চেপে আছে, তা আপনাকে স্বীকার ক'রতেই হবে। ঐ ভার যত দিন ঘাড় থেকে না নামবে, ততদিন আমাদের কোন আশাই নেই। এতদিন হয়তো মূল্য যাচাই ক'রতে পারে নি ব'লে লোকে তাকে মেনে এসেছে।"

"তা হবে। তবে এ জাতি যেদিন স্বাধীনতা ও সভ্যতার শীর্ষ স্থান অধিকার ক'রেছিল, সেদিনও তাদের ঐ বৈশিষ্ট্য ছিল। নিজেদের গৌরবের জন্যে তারা বুক পেতে দিতে পেরেছিল ব'লেই তাদের আসন তারা বিশ্বগৌরবের মাঝখানে দাঁড় করাতে পেরেছিল। পরের মর্য্যাদাকে পূজো ক'রতে গিয়ে তারা নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জ্জন দেয় নি। আপনি কি ব'লতে চান যে, তারা ঐ সব বৈশিষ্ট্যের মূল্য যাচাই ক'রতে পারে নি ব'লেই সেগুলো মেনে চ'লেছে!"

বনবিহারীবাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন—"আপনার যুক্তির কোন মাথামুণ্ডুই নেই। সভ্য-জগৎ যাকে অসার বলে' বুঝতে পেরেছে, তা যে মূল্যহীন তাতে কোন সন্দেহই নেই। বাস্তব জীবনে আমরা ও-সবের কোন মূল্য বুঝতে পারি না; সুতরাং সেগুলোকে মাথায় তুলে নিয়ে, অকারণ নিজের মূর্খতাকে জাহির ক'রে আর লাভ কি বলুন?"

অনি পুনরায় বেশ দৃঢ় ও গম্ভীর হইয়াই বলিল—"লাভ আছে কি না, তা নিয়ে তর্ক চলে না। তবে এত দিন যাতে কোন লোকসান হয় নি, তাকে বাদ দিলেই যে লাভ হবে তারও কোনো মানে নেই। মূল্য যাচাইএর কথা ব'লছেন; কিন্তু এটা মনে রাখ্‌বেন যে—ত্যাগের ভিতর দিয়ে যার প্রতিষ্ঠা গড়ে' উঠেছে, ভোগের ভিতরে বসে' তার ওজন যাচাই করা যায় না। তাতে সবই বিকৃত বলে' মনে হয়। যার বাস্তব মূল্য আমরা বুঝ্‌তে পারি না, তার সব-গুলোকেই যদি বাদ দিয়ে চ'লতে হয়, তা হ'লে ত দেখ্‌ছি শেষ পর্য্যন্ত পুরোদস্তুর নাস্তিক হ'য়ে উঠ্‌তে হবে।"

অনির কথা শেষ না হইতেই সুলতা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"তা কি আর ব'লতে দিদি! ওঁর মত পূরো নাস্তিক আর দু'টি নেই। ওঁর সঙ্গে তর্ক করা মিছে; উনি ভাঙ্‌বেন—তবুও নুইবেন না।"

সুলতা এতক্ষণ অবাক্ হইয়া ইঁহাদের যুক্তিতর্ক শুনিতেছিল। অনির যে এত কথা বলিবার শক্তি আছে, তাহা সে ভাবিতেও পারে নাই। স্বামীর নাস্তিকতাকে সে সর্ব্বদা মানিয়া লইতে পারিত না বলিয়া, অনেক দিন অনেক কথা লইয়া তাঁহার সহিত তর্ক করিয়াছে; কিন্তু তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। আজ অনির নিকট তাঁহাকে বিব্রত হইতে দেখিয়া সুলতা বেশ একটু আমোদ পাইতেছিল; যদিও তাহার অন্তরের গোপন ইচ্ছাটুকু স্বামীকে জয়ী করিবার জন্য যথেষ্টই চেষ্টা করিতেছিল।

সুলতার হাতখানিকে চাপিয়া ধরিয়া অনি হাসিয়া বলিল—"নাস্তিক তো আমরা সবাই বোন্! তবে তফাৎটা হ'চ্ছে এই যে—নাস্তিক হ'লেও আমরা মূর্খ। ওঁদের মত বিদ্যে-বুদ্ধির

দৌড় নেই; কাজে কাজেই ওঁদের সঙ্গে আমরা পাল্লা দিয়ে উঠ্‌তে পারি না। মূর্খ যেটাকে ভক্তি করে না, সেটাকে ভয় করে, অন্ততঃ যতদিন শক্তির মল্ল-পরীক্ষায় সে জয়লাভ ক'রতে না পারে।"

কথায়-বার্ত্তায় রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া বনবিহারীবাবু সহসা তাঁহার অভ্যস্ত হাসিতে তর্কের গাম্ভীর্য্য ভাঙিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আর নয়; আজও না হয় আমিই হার মেনে নিচ্ছি। রাত্রি অনেক হ'য়ে গেছে। যাক্, আজ্‌কের মত অন্ততঃ একটু জলযোগ ক'রেও আমাকে সুখী ক'রবেন বলে' আশা করি অণিমা দেবী।"

মেজর এতক্ষণ মৌনভাবে বসিয়া ইঁহাদের আলোচনা শুনিতেছিলেন। হঠাৎ মনে একটা ধাক্কা খাইয়া যেন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"ব্রেভো—ক্যাপ্টেন্! আমার কাছে যেটা শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাসের রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, আপনি যে তার স্বরূপটাকেই পেয়েছেন, তার জন্যে আপনার সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না।"

এ কথার তাৎপর্য্য বনবিহারীবাবু কিছুই বুঝিলেন না, কিন্তু অনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"এ বিকৃতস্বরূপ আবিষ্কারের কৃতিত্ব ওঁর সৌভাগ্যের, না উর্ব্বর কল্পনার—তা উনিই ভালো জানেন।"

মেজর রায়ের মুখে একটা অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। স্বল্প-আলোকিত অন্ধকারের মধ্যে তাহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না। বনবিহারীবাবু মেজরের হাত ধরিয়া তাঁহাকে ডাইনিং-রুমে লইয়া চলিলেন; অনি বসিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

সুলতা একখানি থালায় করিয়া কতকগুলি ফল আনিয়া অনির সম্মুখে উপস্থিত করিল। এ ব্যবস্থা বনবিহারীবাবুই পূর্ব্ব হইতে করিয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু অনিকে তাহা বুঝিতে দেন নাই।

৯

মেজর ও অনি যখন বাসায় ফিরিলেন, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। সারাপথ একই গাড়ীতে পাশাপাশি বসিয়া আসিলেও মেজরের সঙ্গে অনির বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হইল না। অনি ভাবিয়া পাইতেছিল না—মেজরের সহসা এতখানি পরিবর্ত্তনের কারণ কি ? এই কয়েক দিন ধরিয়া সে লক্ষ্য করিয়াছে, সর্ব্বদা একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান যেন মেজরের বুকে জমিয়া উঠিতেছে। সেই অমূলক অভিমানের প্রতিকার-চেষ্টা অশোভন ভাবিয়া অনি তাহা এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহার গোপন অন্তরে মেজরের এমন একটা দাবী গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহার জন্য এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া অনি নিজেই হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল।

মেজরের শয়ন-গৃহে আসিয়া অনি তাঁহার টীপয়ের উপর জল, সিগার ও স্মেলিং সল্টের শিশি গুছাইয়া রাখিতেছিল। মেজর কোন কথা বলিলেন না ; কিন্তু অনির মুখচোখে হঠাৎ পরাজয়ের ভাব লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় অল্প হাসিলেন। সে হাসিতে গর্ব্বের একটু আভাস থাকিলেও, তাহা যেন বেদনার ভারে ম্লান ও নিষ্প্রভ। মেজরের সেই হাসিটুকু চোখে পড়িতেই অনির মুখখানি মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু নিজের দুর্ব্বলতা

পাছে মেজরের কাছে ধরা পড়িয়া যায়, এই ভয়ে অনি নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া বলিল—"মেজর! আপনার বোধ হয় একটু অভিমান হ'য়েছে? কিন্তু সেটা কি আমারই দোষ? আমি তো—"

অনির কথা শেষ হইতে না হইতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেজর পূর্ব্ববৎ উদাস ভাবেই উত্তর করিলেন—"দোষ কারো নয়। যেখানে অভিমান শুধু অপর পক্ষের অবজ্ঞা ও উপেক্ষা নিয়েই ফিরে আসে, সেখানে অভিমান ক'রবার মত প্রবৃত্তি কোন-ভদ্রলোকের না থাকাই উচিত। অত বড় ট্র্যাজেডী জীবনে ব'য়ে বেড়াবার দুঃসাহস যেন কারো না থাকে।"

মেজর অত্যন্ত হাল্কাভাবে এই সাফাই দিবার চেষ্টা করিলেও অনির বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাহার ভিতর কতখানি গুরু ভার লুকানো আছে। ইহা মুহূর্ত্তে অনিকে একটু বিচলিত করিল; কিন্তু অনি সে ভাব সাম্‌লাইয়া লইয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই কহিল—"চিকিৎসা-বিজ্ঞান আর মনো-বিজ্ঞান যখন ঠিক এক জিনিষ নয়, তখন প্রথমটার সাহায্যে দ্বিতীয়টার সিদ্ধান্ত নির্ভুল না হ'তেও পারে। সমস্ত বিষয় ভাল ক'রে জান্‌বার আগে, অত বড় ভুলটা ক'রে ব'স্‌বেন না, ডাক্তার-বাবু! নিজের দৈন্য আর অযোগ্যতার চাপে যার মাথা সর্ব্বদাই হেঁট হ'য়ে আছে, মহৎকে উপেক্ষা ক'রবার স্পর্দ্ধা তার কোনো দিনই হ'তে পারে না। প্রতিদানের যোগ্যতা নেই ব'লে, সে যে নিজের আগুনে পলে পলে কেমন ক'রে পুড়্‌ছে, তা শুধু সে-ই জানে আর অন্তর্যামী জানেন। তার জীবনেও হয় তো দুঃখের বাষ্প জমে' ওঠে; কিন্তু নিরুপায়। প্রতিদানের শক্তি যার সত্যি নেই, তাকে সংকীর্ণ মনে ক'রবেন না!"

এই কয়েকটী কথার ভিতর দিয়া অনির গোপন অন্তরের ভাব এতই পরিস্ফুট হইয়া তাহার মুখ-চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল যে, মেজর তাহা লক্ষ্য করিয়া যেন সহসা বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা যে এত অধিক পরিমাণে তাঁহাকে জয়ের গৌরবে ভরিয়া দিবে তাহা মেজর কল্পনা করিতেও পারেন নাই। এতখানি প্রত্যাশা করিবার সাহস তো তাঁহার ছিল না। বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মেজর কর-মর্দ্দনের জন্য অনির দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। অনি তাহা দেখিয়াও হস্ত প্রসারিত করিল না। মজ্জাগত সাহেবী কায়দার আদব লইয়াই, মেজর অনির হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া, সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন—"মেনি থ্যাঙ্কস্ মিস্!"

অনির মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না; নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার ন্যায় অনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মেজর শুইয়া পড়িলে, অনি আলো কমাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। আশা ও আশঙ্কার প্রবল জোয়ার-ভাটায় তাহার সমস্ত অন্তর যেন তোলপাড় করিয়া উঠিতেছিল।

লাইব্রেরী-ঘরের ভিতরে গিয়া অনি দরজা বন্ধ করিয়া একখানা চেয়ারের উপর অবশ ভাবে বসিয়া পড়িল। চাপা কান্নায় তাহার বুকখানা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল; অনি প্রাণপণ চেষ্টায় তাহা দমন করিবার জন্য দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া টেবিলটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। আজ যে ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া তাহার প্রাণটা পাক খাইতেছিল, তাহা হইতে চিরসংযতা দৃঢ়চিত্তা সেই নারী কোন মতেই নিজেকে টানিয়া তুলিতে পারিতে-ছিল না। অনি আঘাত করিয়াও আজ আর তাহার প্রাণকে

সবল করিয়া তুলিতে পারিল না। আজ তাহার সারা অন্তর শুধু কাঁদিতে চায়; চোখের জল যেন আজ বাহির হইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে। উঃ এমনি করিয়া তিলে তিলে পরাজয়ের গ্লানিতে সে দেউলিয়া হইয়া পড়িবে! চিরাভ্যস্ত সংযমের বাঁধ ছাপাইয়া অবিরল ধারে অনির অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

বিছানায় পড়িয়া অনি অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্ করিল, কিন্তু তাহার চোখে ঘুম আসিল না; আলোটা একটু বাড়াইয়া দিয়া, শেল্‌ফের উপর হইতে একখানি মাসিক পত্রিকা টানিয়া লইয়া একটু পড়িবার উদ্দেশ্যে পাতা উল্টাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও সে মনোযোগ দিতে পারিল না। একটা অব্যক্ত গুরু-ভারের চিন্তা তাহার সমস্ত হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া ফিরিতেছিল। তাহার প্রতিকার নাই—সমাধান নাই। শয়ন-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া অনি হল-ঘরের বড় জানালাটার পাশে আসিয়া নিতান্ত অবসন্ন ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। আকাশের এ-পার হইতে ও-পার পর্য্যন্ত যেন একখানা কালো মেঘের চাদরে ঢাকিয়া গিয়াছে —একটী তারাও দেখা যায় না। অনি আকাশের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল নিজের জীবনের কথা। তাহারও এ-পার ও-পার যেন এমনি একটা নিকষ-কালো পাথরের চাপে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাইতে বসিয়াছে।

সেদিন দাদুর যে কয়েকটী কথা অনির মনে একটা অবলম্বন আনিয়া দিয়াছিল, আজ আর সে তাহার মধ্যেও কোন সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল না। কেবল ফিরিয়া ফিরিয়া অনির মনে হইতে লাগিল—'এ তো দাদুর উপদেশ হইতে পারে না; যুদ্ধ-শ্রান্ত

দাদু নিশ্চয়ই তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে স্নেহের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। দাদু তো দুর্ব্বল ছিলেন না; জীবনের স্থির সিদ্ধান্ত দাদু কখনই পরিবর্ত্তন করেন নাই। দাদুর আশা ও আকাঙ্ক্ষা যে জগতের সীমা-বদ্ধ গণ্ডীর বাঁধ ছাপাইয়া চলিত।'

আলোটি নিবাইয়া অনি কৌচের উপর শিথিল ভাবে বসিয়া পড়িল। বাহিরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ তখন যেন প্রলয়ের ভীষণ মূর্ত্তিতে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর নিস্তব্ধ বুকে মুষল ধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে। ঝড়ের সাঁ সাঁ শব্দে প্রকৃতির বুক-খানা দুলিয়া উঠিতেছে। অনি স্থির দৃষ্টিতে সেই গাঢ় অন্ধকারের পানে চাহিয়া তাহার রিক্ত জীবনের পথ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু সেখানে তাহার কোন সঙ্কেত নাই—কোন ইঙ্গিত নাই। ঝড় যেন শুধু তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া তাহার অতীত জীবনের স্মৃতির জীর্ণ পাতাগুলিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া তাহারই চক্ষের সম্মুখে উড়াইতে ছিল।

বিহ্বল চিত্তে অনি বইখানিকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ঠাকুর, আমায় পথ বলে' দাও—শক্তি দাও প্রভু!"

* * * *

উন্মত্ত বাদলের পথ-ভ্রান্ত ধারা অনির অনাবৃত মুখ-চোখকে সিক্ত করিয়া দিতেছিল। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার মত মানসিক অবস্থা তখন তাহার ছিল না।

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া মেজর যখন ঘর হইতে বাহির হইলেন, তখনও তাঁহার ঘুমের নেশা সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই। মেজরের শয়ন-গৃহ ও লাইব্রেরীর মাঝখানে যে প্রকাণ্ড হল ঘর ছিল, সেইটাই ছিল উপরের কয়েকখানি ঘরের সাধারণ পথ। শয়ন-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া হল-ঘরের মধ্যে আসিয়াই মেজর সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার পাশে বড় কৌচটার উপর শুইয়া অনি তখনও ঘুমাইতেছিল। অনির এরূপ ভাবে এখানে ঘুমাইয়া পড়িবার কোন কারণ তিনি ভাবিতে পারিলেন না। অনিকে এমন শ্লথভাবে শুইয়া থাকিতে মেজর কোন দিনই দেখেন নাই। শিথিল বইখানি তাহার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। বর্ষণ-ধৌত প্রভাতের সদ্যোজাত আলো অনির সর্ব্বাঙ্গ যেন প্লাবিত করিয়া দিতেছিল। যে অনিকে অতি নিবিড় ভাবে ঘিরিয়া তাঁহার জীবনের সমস্ত অনুভূতি পুঞ্জীভূত ব্যগ্রতায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল, সে অনি যে এত সুন্দর মেজর পূর্ব্বে কখনই তাহা ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহার তন্দ্রা-বিমূঢ় হৃদয় একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে উদ্বেলিত হইয়া নিমেষে সমস্ত অগ্রপশ্চাৎকে যেন ডুবাইয়া ফেলিল। নিজের অজ্ঞাত-সারেই মেজর ধীরে ধীরে অনির শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন।

*　　　*　　　*　　　*

সহসা ওষ্ঠে একটা উষ্ণ-স্পর্শ অনুভব করিতেই অনি ধড়্‌ফড়্ করিয়া জাগিয়া উঠিল। মেজরকে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহার বুকের ভিতরটা থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ক্রোধে, ঘৃণায়, দুঃখে আত্মহারা হইয়া অনি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"মেজর! আপনাকে বিপন্নের আশ্রয়দাতা ব'লে

শ্রদ্ধা ক'রেছিলুম; তাই নিঃসঙ্কোচে আপনার মহত্ত্বের উপর বিশ্বাস ক'রে এই অনাথা বিধবা আপনার আশ্রয় নিয়েছিল। স্বপ্নেও ভাবিনি—আপনি—"

অনির মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। দুই হাতে মুখখানাকে ঢাকিয়া, অনি উচ্ছ্বসিত রোদনের ভারে লুটাইয়া পড়িল।

"অনি বিধবা!" একটা তড়িৎ-প্রবাহ যেন মেজরের বুকে দারুণ আঘাত করিয়া তাঁহাকে অসাড় করিয়া দিল। তাঁহার হাত-পা অবসন্ন হইয়া আসিল। কিছু বলিতে গিয়া, ঠোঁট দু'খানি শুধু বিকৃত ভাবে একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র। কোন কথা বলিবার শক্তি তখন তাঁহার ছিল না। মরার মত বীভৎস দৃষ্টিতে বারেক শুধু অনির দিকে চাহিয়াই, মেজর টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আলমারির কোণে সজোরে ধাক্কা লাগিয়া তাঁহার কপাল কাটিয়া রক্ত বাহির হইল, কিন্তু তাহা অনুভব করিবার মত অবস্থা তখন তাঁহার ছিল না।

*   *   *   *

মেজর চলিয়া যাইবার পরেও অনি কতক্ষণ ধরিয়া যে সেই কোচের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়াছিল, তাহার ঠিক নাই। ভাগ্যহীন জীবনের কোথাও সে কোন কূল-কিনারা খুঁজিয়া পাইল না। আজকার হারানোর ব্যথা যেন তাহার অতীতের সমস্ত হারানোকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। আজ সে যাহা হারাইয়াছে তাহার জন্য নিজেকে সান্ত্বনা দিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। ভবিষ্যতে ইহার ক্ষতিপূরণের আশা নাই;— অতীত-স্মৃতির কোন গৌরব থাকিবে না; সব সম্বল যেন

একটা কালিমায় ডুবিয়া গিয়াছে। অনির ইচ্ছা হইল—আত্মহত্যা করিয়া নিজের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলে।

অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া অনি ধীরে ধীরে তাহার নির্দ্দিষ্ট ঘরে উঠিয়া আসিল। তাহার হাত-পা তখনো এত শ্লথ ও অসাড় হইয়া ছিল যে, তাহার মনে হইতেছিল—সে বুঝি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। একটা তীব্র বিষ যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গকে জর্জ্জরিত করিয়া শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ বন্ধ করিয়া দিতেছিল।

অনি কি করিবে, কোথায় যাইবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না। পৃথিবীতে তাহার এমন কোনো আত্মীয় নাই, বন্ধু নাই, যাহার কোলে মুখ গুঁজিয়া সে একটু শান্তি পায়। সহসা বনবিহারীবাবুর কথা মনে হইতে অনি যেন একটু ভরসা পাইল। বনবিহারীবাবু ব্যতীত আর কোন পরিচিতের কথা সে ভাবিয়া পাইল না। আজ অনির মনে হইতেছিল বটে, তাহার সেই বীরেশ-দা, কালিদাস-দা প্রভৃতির কথা; কিন্তু অনি তো আজ আর তাঁহাদের কোন সন্ধানই জানে না। সে আজ সুদীর্ঘ বারো বৎসর পূর্ব্বের কথা। নিরঞ্জনদা তাহাদিগকে কাশীতে দাদুর কাছে রাখিয়া যাইবার সময় বলিয়াছিলেন—"মা, বিপদে-সম্পদে ছেলেদের কথা ভুলে যাবেন না।" নিরঞ্জনদার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িয়াছিল। মা বাঁচিয়া থাকিতে নিরঞ্জনদা কয়েকবার আসিয়াছিলেন। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর হইতে অনি এ দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাদের কোন খোঁজ-খবরই পায় নাই। তখনকার সেই ছাত্র-নিরঞ্জনদা আজিকার কর্ম্মজীবনে কোথায় সরিয়া গিয়াছেন—সে সন্ধান তাহাকে কে দিবে! কর্ত্তব্য আর নিষ্ঠা দিয়া গড়া কি সে সুন্দর নির্ভীক প্রকৃতি ছিল নিরঞ্জনদার!

মেজরের আশ্রয়ে থাকিতে অনির আর এক মুহূর্ত্তও ইচ্ছা হইল না। অনির সমস্ত অন্তর ঘৃণায় মেজরের উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি বনবিহারীবাবুর শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত তাহার আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, অনি তাড়াতাড়ি একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিবার জন্য বসিল! কিন্তু হঠাৎ কি ভাবিয়া সে আর একটী বর্ণও লিখিতে পারিল না। বনবিহারীবাবুকেও আর তখন সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। জীবনে ভোগের মাত্রাকে বাড়াইয়া চলিবার জন্য যাহারা পিতা-পিতামহের চিরাচরিত প্রথাগুলিকেও ঘৃণা করিয়া পায়ে দলিয়া যায়, তাহাদের কাহাকেও হয় তো বিশ্বাস করা যায় না; অন্ততঃ অনি সে শক্তি ও সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এই সকল সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ধ্বজাধারিদের উপর অনির সারা অন্তর যেন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। এই সব সম্ভ্রান্ত ও সুসভ্য সমাজের আদর্শ যাঁহারা, তাঁহাদের অধঃপতন অসভ্য ও অনার্য্যদের অধঃপতনের চেয়েও সাঙ্ঘাতিক। অনার্য্যের অধঃপতিত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতিকে বলে না পারিলেও কৌশলে আয়ত্ত করা যায়; বুদ্ধি ও মানসী বৃত্তির দুর্ব্বলতা তাহাকে অনেকটা শক্তিহীন করিয়া রাখে; সে ছলনার জাল পাতিতে পারে না। কিন্তু এই সুসভ্য সমাজের প্রশস্ত ছায়ার তলে থাকিয়া যাহাদের পাপবৃত্তি পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তাহাদের বিষাক্ত অন্তর বাহিরের ছদ্ম আবরণে আত্মগোপন করিয়া থাকে। সুযোগ-মত সর্ব্ববিধ দুরভিসন্ধির অব্যর্থ বাণপ্রয়োগে তাহারা সিদ্ধহস্ত। অনার্য্য দস্যু অন্তর-বাহিরে দস্যু, আর সুসভ্য পিশাচ 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ'।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া অনি নিশ্চলভাবে বসিয়া ভাবিতেছিল—সে

কি করিবে! কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিবার মত মনের অবস্থা তখন তাহার ছিল না। বনবিহারীবাবুর কথা ভাবিতে ভাবিতে সহসা অনি যখন তাঁহার পিছনে সুলতার শান্ত ও পবিত্র ছবিখানি দেখিতে পাইল, তখন আর তাহার সন্দেহের তিল মাত্র অবসর রহিল না। সুলতার কথা মনে হইতেই অনি অনেকখানি আশার সন্ধান পাইল।

মনের সমস্ত দুর্ব্বলতাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া অনি বনবিহারী-বাবুকে পত্র লিখিল। বেশী কথা লিখিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। সে কেবলমাত্র লিখিল—

"বন-দা, দয়া করিয়া একবার আসিবেন; ঠিক যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থাতেই। আশা করি, ভগিনীর এ অনুরোধ উপেক্ষা করিবেন না।"

ইতি—

ভাগ্যহীনা অনি।

বেয়ারার হাতে পত্রখানি দিয়া অনি তাহাকে তখনই মোগলসরাইএর ডাক্তারবাবুর নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল; পূর্ব্বের মত যেন আর আদেশ করিতে সে পারিল না। মোগলসরাইএ যাইবার রেল ভাড়াও অনি তাহার হাতে দিল।

তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বেয়ারা শিউ-কিষণ্ একবার মাত্র অনির মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেল। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস তাহার হইল না।

সন্ধ্যার গাড়ীতে সুলতা ও বনবিহারীবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনির পত্রে সকল বিষয় সুস্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া, এবং বেয়ারার নিকট হইতেও সে সম্বন্ধে কিছু জানিতে না পারিয়া বনবিহারীবাবু একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশেষতঃ অনির সহসা ঐরূপ 'বনদা' সম্বোধন যেন তাঁহার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে হঠাৎ ঘোলা করিয়া তুলিয়াছিল।

মেজরের ঘরে কাহাকেও না দেখিয়া বনবিহারীবাবু সুলতাকে সঙ্গে করিয়া বরাবর অনির ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। অনি তখনো নিশ্চলভাবে চৌকীর এক পাশে বসিয়া কি ভাবিতেছিল। তাহার মুখ-চোখ দেখিয়া বনবিহারীবাবু সহসা চমকিয়া উঠিলেন; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সাহস হইল না। মনে হইল একটা প্রবল ঝড় যেন অনির জীবনকে হঠাৎ ওলট্-পালট্ করিয়া দিয়া গিয়াছে।

অনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বনবিহারীবাবুর পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। বনবিহারীবাবু ইহাতে অনেকখানি আশ্চর্য্য হইলেন। অনিকে এরূপ ভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে তিনি পূর্ব্বে কখনো দেখেন নাই। সুলতাকে কাছে টানিয়া লইয়া অনি তাহার হাতখানি কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। কিছুক্ষণ কাহারো মুখ হইতেই কোনো কথা বাহির হইল না।

হয় তো মেজরের কোনরূপ বিপদ হইয়াছে,—এই আশঙ্কা হইতেই বনবিহারীবাবু বলিলেন—"মেজরকে দেখ্‌ছি না যে অনি! তিনি কি বেরিয়ে গেছেন? এখন বেশ ভাল আছেন তো?"

অনি সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিল—"আমার নিজের

একটা কাজের জন্যে আপনাকে ডেকেছি দাদা। আপনি দয়া ক'রে একটু কষ্ট স্বীকার ক'রবেন কি?"

"নিশ্চয় অনি, তোমার কোনো কাজে লাগ্‌বার সুযোগ পেলে' বরং সুখীই হব। তার জন্যে এত ফর্‌ম্যাল্‌ ভাবে ব'ল্‌বার কোন দরকার নেই। কি ক'রতে হবে বলো—"

অনি বলিল—"আমায় কোলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে হবে আপনাকে, আজই রাত্রের ট্রেনে।"

বনবিহারীবাবু ভিতরের অবস্থা তখনো ঠিক উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না; অথচ অনির মুখ-চোখের অবস্থা দেখিয়া তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"তোমায় পৌঁছে দিয়ে আস্‌বো নিশ্চয়ই; তবে চাকরী-জীবীরা তো হঠাৎ ইচ্ছা ক'রলে কোথাও যেতে পারে না—দিদি। ছুটি মঞ্জুর করানোর জন্যে অন্ততঃ একটা দিন সময় আমায় দিতে হবে। কা'ল রাত্রের ট্রেনে রওনা হ'লে তেমন ক্ষতি হবে কি কিছু?"

"না, ক্ষতি কিছু নেই; তবে—" দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া, ক্ষণেক কি ভাবিয়া, অনি বেগে বলিয়া উঠিল—"কিন্তু এখানে আর এক মুহূর্ত্তও নয় দাদা!"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই অনি মুখ নীচু করিয়া স্বর্ণলতার হাতের চুড়ি কয়গাছি লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল।

ব্যাপারটা বনবিহারীবাবুর কাছে একটা হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইলেও, তিনি ভদ্রতার অনুরোধে অনিকে বলিলেন—"তবে, এই একদিনের জন্যও অন্ততঃ, তোমাকে আমার পর্ণকুটীরে থাকতে

হবে ; তার মধ্যেই আমি ছুটির ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌বো। কেমন! তাতে রাজী আছ তো?"

সুলতার সকল বিষয় বুঝিয়া উঠিবার যোগ্যতা ছিল না ; কিন্তু অনির আতিথ্য গ্রহণের কথা শুনিয়াই সানন্দে তাহার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিয়া উঠিল—"তাই ভালো, দিদি, আমাদের ওখানেই চলুন ; এক্ষুনি।"

অনি উদাসভাবে উত্তর করিল—"হাঁ ; তাই যাবো বোন।"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সুলতা আবেদনের দৃষ্টিতে একবার স্বামীর মুখপানে চাহিল। পত্নীর সরল দৃষ্টিটুকুর অর্থ বুঝিলেও, স্বামী তাহাতে কোনো মতামত প্রকাশ করিলেন না।

বনবিহারীবাবু অনুমান করিলেন—সম্ভবতঃ মেজরের সহিত অনির কোনরূপ মনোমালিন্য হইয়াছে, যাহার জন্য অনি আর এখানে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ইচ্ছুক নহে।

মেজর তখনো ফিরিয়া আসেন নাই। অনি সাড়ে সাতটার গাড়ীতে এখান হইতে রওনা হইবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু একটু বিশ্রাম করিয়া লইবার অছিলায় বনবিহারীবাবু পরের ট্রেন ধরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রকাশ্যে কোন কথা বলিতে না পারিলেও, মেজরের অনুপস্থিতিতে তাঁহার গৃহ হইতে অনিকে নিজের আশ্রয়ে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে কি না, বনবিহারীবাবু তাহা ঠিক ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অথচ অনির এক-মাত্র প্রার্থনা জানিয়াই তিনি নিজে হইতে যাহার ভার লইয়াছেন, তাহা এড়াইয়া চলিবার কোন পথও খুঁজিয়া পাইলেন না।

রাত্রি নয়টার মধ্যেও মেজর-ফিরিলেন না দেখিয়া বনবিহারী-বাবু অনিকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। সুলতা এতক্ষণ জিনিষপত্র

গুছাইবার ধূমধামের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। কি কি গুছাইতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য, সে অনির হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল ; কিন্তু অনি সে-বিষয়ে পূর্ব্ববৎ নিশ্চেষ্ট থাকিয়াই উত্তর করিল—"কিচ্ছু না।"

বনবিহারীবাবু ও সুলতা উভয়েই যেন অনির ভাবগতিক দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো একটা গূঢ় রহস্য আছে! এ কথা অনুমান করিলেও, কেহই তাহা লইয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিলেন না।

নিজের কয়েকখানি কাপড় ও খান-কয়েক বই এবং খাতাপত্র —যাহা লইয়া অনি তিন মাস পূর্ব্বের এক মধ্যাহ্নে আসিয়া এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল—সেই কয়টীকে মাত্র আবার তাহার বেতের ছোট্ট বাক্সটির মধ্যে গুছাইয়া লইয়া অনি বাহির হইল।

ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ ও স্থান এই অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অনির এত আপনার হইয়া উঠিয়াছিল যে, আজ এক নিঃশ্বাসে ছাড়িয়া যাইবার ভিতরেও সে সবের আকর্ষণে অনির চোখ দুইটি ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। হল-ঘরের ভিতরে যেখানে দেওয়ালের উপর মেজরের বড় ফটোগ্রাফখানা ঝুলিতেছিল, সেখানে আসিতেই অনির পা দুইটি যেন তাহার অজ্ঞাতসারে বারেকের জন্য থামিয়া গেল। প্রাণপণ চেষ্টায় দর্শনব্যাকুল চোখ দুইটিকে মাটির দিকে নামাইয়া অনি দ্রুতবেগে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

বনবিহারীবাবু ও সুলতা তখন গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিয়াছেন। অনি নীচে আসিয়া বয় ও বেয়ারার হাতে একটী করিয়া টাকা দিয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইল। অশিক্ষিত ও সরলহৃদয়

চাকর দুইটির মুখে কোন কথাই বাহির হইল না; তাহারা শুধু অনির মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

*　　*　　*　　*

মোটর ছাড়িয়া দিলে সুলতা অনির হাতখানাকে কোলের উপর টানিয়া লইয়া বলিল: "দিদি, তুমি যে এক নিমিষে ঝড়ের মত সকলকে ছেড়ে কোলকাতায় পালাতে চাচ্ছ কেন, তা ভেবে পাচ্ছি নে।"

অনি সস্নেহে তাহার মাথাটিকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ঘূর্ণীর স্রোতে বা ঝড়ের ঝাপ্‌টায় যে সব আল্‌গা ঘাস-পাতা এক জায়গায় এসে মেশে, তাদের ছাড়াছাড়িও হ'য়ে যায় আবার অমনি একটা ঝড় কিম্বা ঘূর্ণীর ভিতর। যারা আগাগোড়াই পৃথক, তারা কখনই এক জায়গায় স্থায়ী হ'তে পারে না দিদি। মানুষের জীবনেও ঠিক্ তাই ঘটে, এতে ভাব্‌বার বা জান্‌বার কিছুই নেই বোন্।"

বনবিহারীবাবু অবাক্-বিস্ময়ে অনির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যাহার সব কিছু জানিবার জন্য মনে অদম্য একটা আগ্রহ হয়, তাহাকে সম্মুখে পাইয়া তাহার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলিতেও যেন একটা সঙ্কোচ আসে। সেটা লজ্জা না দুর্ব্বলতা তাহা ঠিক বলা যায় না।

ট্যাক্সি যখন ষ্টেশনে আসিয়া থামিল, তখন ট্রেন 'ইন্' হইয়াছে। যে বেনারস ছাড়িয়া যাইবার জন্য অনি এতক্ষণ উতলা হইয়া পড়িয়াছিল, সেই বেনারস ছাড়িয়া যাইতেও অনির মনটা এইবার কাঁদিয়া উঠিল।

দুই দিন পরে মেজর যখন বাংলোয় ফিরিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া আর চেনা যায় না। একটা ভীষণ আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যেন তাঁহার যাবতীয় সমৃদ্ধি এই দুই দিনের মধ্যেই পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। ঝড়-পোহানো একটা পঙ্গু ও অবসন্ন কাকের মত অবস্থায় মেজর বাহিরের ফটকটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভিতরে আসিতে তাঁহার সাহস হইতেছিল না। কোটর-গত চক্ষু দুইটী দেখিলে হয় তো মনে হয় ক্ষীণ-নিষ্প্রভ জীবনীশক্তি এখনো বর্ত্তমান আছে; কিন্তু সে দৃষ্টি এমনই ঝলসিয়া গিয়াছে যে, তাহাকে আর দৃশ্য জগতের আলোর সম্মুখে তুলিয়া ধরা যায় না।

একটা অতর্কিত ভূমিকম্প অতি অল্প সময়ের মধ্যে এমন বিশৃঙ্খলভাবে সব ওলট-পালট করিয়া দিয়াছিল যে, অল্প-বুদ্ধি বেয়ারা ও বয় বেচারী তাহার কোন সূত্রই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। অনি চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্ব হইতে মেজরকে অনুপস্থিত দেখিয়া, এবং অনির ওরূপভাবে চলিয়া যাইবার কোন কারণ ভাবিতে না পারিয়া তাহারা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ শিউকিষণ; সে চাকর হইলেও তাহার সেবার ভিতর দিয়া অনি ও মেজরকে সে বিশেষ স্নেহ করিত। মায়িজী কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন, ডাক্তার-সাহেবও দুই দিনের মধ্যে কুঠীতে ফিরিলেন না: শিউকিষণ সত্য-সত্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

মেজরকে গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ভগ্লু ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে সেলাম দিল ও এক নিঃশ্বাসে অনেক

অভিযোগ ও অনুযোগ শুনাইয়া ফেলিল। মেজর নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া সব শুনিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন কি না বলা যায় না।

মেজরের মুখ-চোখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বয় আতঙ্কে থামিয়া গেল। মেজরের তখনকার চেহারা দেখিয়া তাহার অনুমান করিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না যে তাঁহার পুনরায় সেইরূপ একটা কঠিন অসুখ হইয়াছে। সরল-চিত্ত হিন্দুস্থানী কিশোর ব্যথিত হৃদয়ে প্রভুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মেজর পূর্ব্বের ন্যায় নির্ব্বাক্ ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন; কোনো কথা বলিতে বা কোনো আদেশ করিতে পারিলেন না।

অনির চলিয়া যাওয়ার সংবাদ পাইয়াও ডাক্তার নিঃসঙ্কোচে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার নিজস্ব অধিকার এই ঘর-বাড়ী, তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত আজ্ঞাবহ ভৃত্য ভগ্‌লু ও শিউকিষণ—সব কিছুই যেন আজ বিধ্বস্ত জীবনের তটভূমি হইতে সুউচ্চ পর্ব্বতশিখরের মত মনে হইতে-ছিল। যে পদ-সেবী ভগ্‌লু ও কিষণের অস্তিত্ব তাঁহার নিকট কখনো কোন বিশিষ্টতা লইয়াই দাঁড়াইতে পারে নাই, এমন কি যাহাদিগকে কখনো সমতলবর্ত্তী ভাবিতেও তাঁহার ঘৃণা হইত, সেই বয় ও বেয়ারার পানে চোখ তুলিয়া চাহিবার সাহসও আজ আর মেজরের নাই। তাঁহার সর্ব্বদাই মনে হইতেছিল, অপ্রকাশিত গোপন পাপও পাপীর শিরকে নত করিয়া রাখে।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত নিজের অবশ পদদ্বয়কে কোন রূপে টানিয়া লইয়া মেজর উপরের ঘরে উঠিলেন। অনি তাহার

ঘরে নাই, কিন্তু মেজর সে ঘরখানি হইতেও নিজেকে গোপন রাখিবার জন্য আজ প্রাণপণ চেষ্টায় চোরের মত নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অতি বড় শত্রুও যাঁহাকে কোন দিন ধর্ম্মভীরু বলিয়া অপবাদ দিতে পারিত কি না সন্দেহ, খেয়ালের ঘূর্ণাবর্ত্তে যাঁহার আত্মপ্রবৃত্তি বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেও কখনো দ্বিধাবোধ করে নাই, আজ প্রবৃত্তির সংঘর্ষে তাঁহার সমস্ত অন্তরে যেন দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কৌচের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজর বলিয়া উঠিলেন—"ভগবান, জানি না তুমি আছ কি না ; যদি থাকো, আমায় শান্তি দাও।"

পেখমের সৌন্দর্য্যে উৎফুল্ল ময়ূর যেমন সহসা তাহার কুৎসিত চরণ দেখিয়া শিহরিয়া উঠে, নিমেষে তাহার সকল নৃত্য থামিয়া যায়, মেজরও সেইরূপ আজ তাঁহার দৃপ্ত জীবনের পঙ্কিলতাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এতদিন তিনি নিজেকে চিনিতে পারেন নাই। ছদ্ম মহত্ত্বের ভিতর যে পাপ লুকাইয়াছিল, মেজর আজ তাহার স্বরূপ দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিলেন। এতকাল শুধু পৃথিবী ভোগের বাসর মনে করিয়া, জীবনের অগ্রপশ্চাৎ চাহিয়া দেখিতে তিনি কখনই চেষ্টা করেন নাই। মহত্ত্বের আদর্শে যাহাকে বিপন্ন বলিয়া আশ্রয় দিয়াছেন, ভোগের দুয়ারে তাহাকে বলিদান করিয়া সে আদর্শের পূর্ণাহুতি হইয়াছে। জীবন-পথে যাহারা একে একে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেক জীবনটীকে কিরূপে ব্যর্থ করিয়া পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছেন, আজ আর সে কথা ভাবিয়া দেখিবার মত একবিন্দু শক্তিও মেজরের বুকে নাই। অন্তরের সেই সব অনাদৃত অনুভূতি

আজ তাঁহার অচঞ্চল শান্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাণের সে শান্তি, হৃদয়ের সেই অসমসাহসিকতার তেজ বিপ্লবের আগুনে ছাই হইয়া গিয়াছে। এ আগুন বুঝি আর নিবিবে না।

আজ আর মেজর নিজেকে সান্ত্বনা দিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। যে সব মহত্ত্বের গৌরব লইয়া নিজেকে অনেকবার সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজ তাহা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মেজর নিজেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। নিজের অশাসিত প্রবৃত্তি এতকাল যে মহত্ত্বের রূপ লইয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া আসিয়াছে, সে কথা মেজর কোনো দিন কল্পনাও করিতে পারেন নাই। অনিকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন ; তাহার বিপন্ন অবস্থায় দয়ার্দ্র হইয়া, না—তাহার দেহসম্ভারের পরিপূর্ণতায় প্রলুব্ধ হইয়া ; সে কথা আজ যেন তিনি অন্তরে অন্তরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। কিন্তু কে তাহার মীমাংসা করিয়া দিবে! জীবনের পথে কত অসহায় বিপন্ন পথিক আর্ত্তনাদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ; —কৈ, তিনি তো কাহারো সন্ধান রাখেন নাই! জীবনের ইতিহাসে আজ কোনো পাতায় এমন একটী উদাহরণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহার গৌরব অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারে।

যে অনিকে কেবল মাত্র আশ্রয় দিয়া তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহার রোগশয্যায় সেই অনির সেবা যে তাঁহার সে অনুগ্রহের ঋণকে ছাপাইয়া তাঁহাকেই ঋণী করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—'তাহার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।' তাই অনি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে তো

কোন দিনের জন্যও তাঁহার নিকট আশ্রয় ভিখারিণী হইয়া আসে নাই।

ইদানীং বনবিহারীবাবুর উপর মেজরের একটা অযথা আক্রোশ গড়িয়া উঠিয়াছিল; হয় তো বনবিহারীবাবুর জীবনে তাহার ছায়াপাতও হয় নাই। অনি বনবিহারীবাবুর সহিত যেরূপ অবাধে তর্ক ও আলোচনা করিত, তাহা মেজরের আদৌ ভাল লাগিত না। বনবিহারীবাবুর সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় ঘনিষ্ঠতা রাখাটা তিনি মনে মনে সমর্থন করিতে পারিতেছিলেন না বলিয়াই, তাহার আসা-যাওয়া ও আহ্বান-অভ্যর্থনা-গ্রহণ তাঁহার পছন্দ হইত না। যতবার তাঁহার মনে হইয়াছে অনি বনবিহারীবাবুর সহিত অধিক আগ্রহে মেলামেশা করিতেছে, ততবারই তিনি মনে মনে যাচাই করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—'অনি কাহার নিকট অধিক উপকৃতা ও ঋণী? বনবিহারীবাবুর দাবী তাঁহার অধিকারকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না।' কিন্তু কিসের এই দাবী? আজ নিজের কাছে এ প্রশ্নের জবাবদিহি করিতেও মেজরের মাথা হেঁট হইয়া যাইতেছিল। ······কিন্তু অনি কোন দিনের জন্যও বলে নাই যে সে বিধবা। পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল—অনি অযথা কোন বিষয় উত্থাপন করা পছন্দ করিত না; অকারণ কৌতূহলকেও অনি কখনো প্রশ্রয় দেয় না। অনি বিধবা কি সধবা, সে প্রশ্ন তিনিও কখনো করেন নাই। করিলেও হয় তো কোন ফল হইত না। অনির বিপন্নতাকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন,—সে বিধবা, কি কুমারী তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার ছিল না। বিপন্নাকে আশ্রয় দেওয়া মানে কি তাহার দেহসম্ভারকে হাতে পাইবার প্রচ্ছন্ন লালসা!

সারাদিন মেজর শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। শান্তির কোন সন্ধান তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। বয় ও বেয়ারা অনেকবার আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে; তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস তাহাদের হয় নাই। সমস্ত বাড়ীটাই যেন একটা রুদ্ধ বেদনার নিস্তব্ধতায় থম্ থম্ করিতেছিল। বেলা শেষ হইয়া আসিল, মেজর তবুও ঘর হইতে বাহির হইলেন না; নিঝুম হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। রাজপথ হইতে কর্ম্ম-প্রত্যাগত কুলীদের কোলাহল ভেদ করিয়া একটা অসংলগ্ন গজলের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

হরবকৎ ইয়ে পিয়ালা মে
দিল্ করে মস্‌গুল।
ইমারৎ ই জান্ বাগিচায়
তান্ ধরে বুল্ বুল্।

ভাঙা-ভাঙা গানের শব্দগুলি মেজরের কাণে যাইতেই, তিনি বিছানার উপর একবার উঠিয়া বসিলেন। ঐ নিরন্ন দিন-মজুরদের প্রাণের আনন্দটুকুও আজ তাঁহার নিকট বড় লোভনীয়। চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া তিনি জানালার ধারে আসিয়া বসিলেন। আর একদল কুলী তখন খুব সোরগোল করিতে করিতে গাহিয়া চলিয়াছিল—

"তাজা চুয়া মিঠা দারু
পিয়ো পিয়ো রে মেরি জান্।
দিল্‌ভি আচ্ছা হোগা সাচ্চা
টুট্ যাওয়ে হায়রাণ্॥"

মেজর কাণ পাতিয়া শুনিতেছিলেন; ঐ দরিদ্র কুলীদের আনন্দ-গান তাঁহার বুকের ব্যথাকে গোপনে কিসের ইঙ্গিত করিয়া গেল।

১৩

অনি ও সুলতাকে সঙ্গে করিয়া বনবিহারীবাবু কলিকাতায় আসিলেন। ভবানীপুর—চন্দ্রমাধব ষ্ট্রীটে তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে আসিয়া উঠিবেন বলিয়া বনবিহারীবাবু পূর্ব্বেই তাঁহাকে তার করিয়া দিয়াছিলেন।

*   *   *   *

অনির পিসিমা, মোক্ষদাসুন্দরী, বাগবাজারে—বোসপাড়া লেনে থাকিতেন; তাঁহার স্বামী গোপীমোহন ছোট আদালতের উকীল। মোক্ষদাসুন্দরী রাধাকিশোরের সহোদরা ভগিনী না হইলেও, রাধাকিশোর যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন তিনি মোক্ষদার খোঁজ-খবর ও তত্ত্ব-তল্লাস করিতে কখনো ত্রুটি করেন নাই। গোপীমোহন যখন প্রথমে হাইকোর্টে ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। রাধাকিশোর মফঃস্বল হইতে মক্কেল সংগ্রহ ও যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতে কখনো কোনরূপ কৃপণতা করেন নাই। ভগিনীপতি গোপীমোহন তাঁহার সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। অনির পিতা যতদিন বাচিয়া ছিলেন, ততদিন মোক্ষদা ও গোপীমোহন অনেকবার অনিকে কলিকাতায় আনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা নিঃসন্তান বলিয়া রাধাকিশোরের একমাত্র কন্যা অনিই যে তাঁহাদের সর্ব্বস্নেহের একমাত্র আধার, সে কথা মোক্ষদা-সুন্দরী প্রকাশ্যে বহুবার ঘোষণা করিতে বাকী রাখেন নাই।

*　　*　　*　　*

বনবিহারীবাবুকে সঙ্গে করিয়া অনি পরদিন বিকালে বাগবাজারের পিসিমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনির ইচ্ছা ছিল যে পর্য্যন্ত সে কলিকাতায় কোনরূপ উপার্জ্জনের সংস্থান করিতে না পারে, পিসিমার আশ্রয়েই থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইবে; যদিও মায়ের মৃত্যুর পর অনি নিজের বিপন্ন অবস্থার কথা জানাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ সহানুভূতির সাড়া না পাইয়া, সে আশা অতি ক্ষীণভাবেই পোষণ করিয়াছিল।

গোপীমোহন তখন আদালত হইতে ফিরিয়া বৈঠকখানায় তামাক ও গল্পের আড্ডা জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। ছোট আদালতে তাঁহার যে বেশ প্রসার-প্রতিপত্তি জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা গোপীমোহনের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াই অনুমান করা যায়। অনি তাহার কৈশোরে যে অবস্থায় গোপীমোহনকে দেখিয়াছিল, বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তাহা মিলাইয়া লইয়া তাঁহাকে সহসা সে চিনিয়া উঠিতে পারিল না।

অনির বিস্তৃত পরিচয় শুনিয়া গোপীমোহন বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাধাকিশোরের মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বিপন্ন জীবনের কাহিনী শুনিয়া গোপী-মোহনের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। অনি পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল

পত্র দিয়াছিল, তিনি তাহার একখানির কথাও জানিতেন না। গোপীমোহন আদালতে থাকিবার কালে যে সব পত্র আসিত, মোক্ষদাসুন্দরী তাহা খুলিয়া দেখিতেন। অতি সরল ও উদার-প্রকৃতি স্বামীর উপর মোক্ষদাসুন্দরী এরূপ নিপুণভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছিলেন যে স্বামীর মার্জ্জিত ওকালতি বুদ্ধিও সব সময় তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। গোপীমোহন সমস্ত বুঝিয়াও কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। মোক্ষদা-সুন্দরী পরিপূর্ণরূপে অসুন্দরী হইলেও, তাঁহার বিষয়ে স্বামীর বেশ একটু দুর্ব্বলতা ছিল।

অনির হাত ধরিয়া গোপীমোহন অন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোক্ষদা তখন পাচকের নিকট মধ্যাহ্নের লবণ তৈলের হিসাব বুঝিয়া লইয়া, সায়াহ্নের সরঞ্জাম মঞ্জুর করিতেছিলেন। সহসা স্বামীর পশ্চাতে নবাগতা একটী মহিলাকে দেখিয়া তিনি যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। মোক্ষদার অন্দরে কখন কোন অতিথির শুভাগমন হইত কি না সন্দেহ। প্রতিবেশিনী মহিলারাও নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কখনো মোক্ষদার নিকট আসিতেন না। মোক্ষদা বিরক্তিপূর্ণ মুখে ভ্রূ দুইটীকে ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বক্রদৃষ্টিতে অনির আপাদ-মস্তক একবার দেখিয়া লইলেন।

গোপীমোহন বাড়ী ঢুকিয়াই আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিলেন —"ওগো—দেখ্‌ছো, কে এসেছে! এই যে অনু, আমাদের রাধুর মেয়ে।"

অনি মোক্ষদাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইল।

মোক্ষদা যেন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন—"কোন্ রাধু! কোথাকার!!"

কথাটা অনির বুকে খচ্ করিয়া বিঁধিল। এই মোক্ষদাসুন্দরী তাহারই পিসিমা!

স্বামীর মুখে সকল কথা শুনিয়া মোক্ষদা যেন অতি কষ্টে একটা ক্ষীণ স্মৃতিকে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—"ওঃ; আহা! বেশ! বেশ! এখানে কোথায় থাকো মা?"

স্ত্রীর কথায় বিশেষ লজ্জিত হইয়া গোপীমোহন তাড়াতাড়ি পত্নী-পক্ষের অভ্যর্থনার ত্রুটিটুকু সারিয়া লইবার জন্য বলিয়া উঠিলেন—"দেখ দেখি, আমরা থাক্‌তে মা আবার থাক্‌বে কোথায়! ও তো মাত্র কা'ল এসেছে। রাত্রে এসে কোথায় বাসা খুঁজে বেড়াবে, সেই জন্যে কালই এসে এখানে উঠতে পারে নি। ঐ যে ভদ্রলোকটী এসেছেন, ওঁর বাসাতেই বুঝি উঠেছ মা? উনি বোধহয় তোমার শ্বশুরবাড়ীর লোক?"

অনি সংক্ষেপে উত্তর করিল—"হাঁ; ওঁর বাসাতেই আমি আছি।"

মোক্ষদার মুখ-চোখের ভাব ও অভ্যর্থনার ভঙ্গিমায় অনির পিত্ত প্রায় বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি তাহার অত বড় বিপদের সংবাদ পাইয়াও কোন খোঁজ-খবর করেন নাই, উপরন্তু স্বামীকে সে সকল সংবাদ পর্য্যন্ত জানিতে দেন নাই, সেই পিসিমার নিকট হইতে অনি ইহার বেশী বিশেষ কিছু আশা করিতে পারে নাই। তবুও সে আসিয়াছিল, তাহার আশ্রয়ের নিতান্ত অভাব বলিয়া। প্রয়োজন হইলে, অনি নিজের খোরাকী দিয়াও সেখানে থাকিতে পারে; কিন্তু এখন আর সে প্রবৃত্তি রহিল না।

"তবে আসি পিসি-মা!" বলিয়া অনি মোক্ষদাকে আর

একবার প্রণাম করিল; অন্তরে ঠিক ভক্তি ছিল কি না বলা যায় না। গোপীমোহন দাঁড়াইয়া পত্নীর রায় শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মোক্ষদার অভ্যর্থনা দেখিয়া তিনি সত্যই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু কোন কথা বলিবার ইচ্ছা বা সাহস তাঁহার হইল না।

মোক্ষদা চক্ষু দুইটিকে ঈষৎ মুদ্রিত করিয়া, গাল-ভরা দোক্তা-পানের কিঞ্চিৎ রস গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন—

"আচ্ছা—এসো মা। এবার যখন ক'লকেতায় আস্‌বে, আমার এখানেই উঠো! আজ রাত্রে এখানে থেকে গেলেও হ'তো।"

অনি মনে মনে না হাসিয়া পারিল না। ঠিক এই রকমের একটা উত্তর সেও কল্পনা করিয়াছিল।

নির্ব্বাক্ গোপীমোহন অনির সঙ্গে সঙ্গে সদর পর্য্যন্ত আসিলেন। কি বলিবেন লজ্জায় তাহা ভাবিতে পারিলেন না। বনবিহারীবাবু ও অনি তাঁহার পদধূলি লইয়া বিদায় হইল।

১৪

অনি যে বিধবা তাহা বনবিহারীবাবু এতদিন জানিতেন না। তিন চারি মাসের মধ্যে আলাপ-পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা যথেষ্টই হইয়াছিল; কিন্তু নাম-ধাম ও কুল-পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করা আধুনিক সভ্যতা-সঙ্গত নয় বলিয়া সে বিষয়ে কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। আজ গোপীমোহনবাবুর সহিত অনির কথোপকথন কালে বনবিহারীবাবু সকল বিষয় জানিতে

পারিয়া হঠাৎ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। অনির সঙ্গে যখন তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়, তখন বনবিহারীবাবু ভাবিয়াছিলেন—অনি বোধ হয় মেজরের কোন আত্মীয়া তবে সে আত্মীয়তার বিষয় তিনি বিশেষ কিছু অনুসন্ধান করিবারও চেষ্টা করেন নাই; মেজর ও অনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনো দিন সে কথা উত্থাপন করেন নাই। অনি যেদিন হঠাৎ মেজরের আশ্রয় ছাড়িয়া আসে, সেদিন তিনি কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে অনি ও মেজরের মধ্যে কোন আত্মীয়তার সূত্র থাকিলেও তাহা ক্ষীণ—দুর্ব্বল; হয় তো সেটা মাত্র বন্ধুত্বের দাবী। তাহার পর অনি যেদিন সেই দুই ছত্রের একখানা পত্র লিখিয়া তাঁহাকে 'বনদা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া ফেলিল, সেইদিন হইতে বনবিহারীবাবুর থাকা-না-থাকা অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষাই ওলট্‌-পালট্‌ হইয়া গিয়াছিল। সেই নির্ভরতার দাবীকে আবার নূতন করিয়া নাড়া-চাড়া করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই; পাছে সে সম্বন্ধের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

অনি ও বনবিহারীবাবু যখন পিসিমার বাড়ী হইতে বিদায় হইয়া রাস্তায় আসিয়া নামিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য আলোক-শ্রেণী সারা পথকে যেন হাসির মালায় বরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু অনির হাসির শেষ কণাটিও তখন দুশ্চিন্তার অশ্রুতে ভিজিয়া উঠিয়াছিল।

বনবিহারীবাবু একখানা গাড়ী ডাকিয়া অনিকে উঠাইয়া নিজে উঠিয়া বসিলেন। অনি ভারাক্রান্ত মনে গাড়ীর এক কোণ ঘেঁসিয়া চুপ করিয়া বসিল। নিজের অদৃষ্ট-চিন্তায় তাহার মনটা এত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কথা বলিবার

শক্তিটুকু পর্য্যন্ত সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এতদিন অনি তবুও মনে একটা আশা পোষণ করিয়াছিল যে, তাহার পিসিমা আছেন। দূর হইতে পিসিমার সাড়া না পাইলেও সম্মুখে আসিয়া একটুকু স্নেহের পরশ পাইবার আশা অনি ছাড়িতে পারে নাই; স্নেহের পিপাসায় তাহার বুকখানা মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ অনি যখন সেখান হইতেও হতাশ হইয়া ফিরিল, তখন আর সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। আজ তাহার সত্য সত্যই মনে হইতেছিল—এ পৃথিবীর সকল আশ্রয়, সকল করুণার দ্বার তাহার পক্ষে চিররুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; আজ সে অনাথা, নিরাশ্রয়া—পথের ভিখারিণী।

অনিকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য বনবিহারীবাবু অনেকক্ষণ হইতেই অবসর খুঁজিতেছিলেন; কিন্তু অনির ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তিনি কোনো কথা উত্থাপন করিতে পারিতেছিলেন না।

বনবিহারীবাবুর পক্ষে অধিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত অসহ্য বলিয়া মনে হইল; মানুষের ইহা অপেক্ষা গুরুতর শাস্তি আর কিছু থাকিতে পারে কি না, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না।

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া একটু সঙ্কোচের সহিত বনবিহারীবাবু জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন—'অনি, তুমি তো কৈ এতদিন আমাদের ও-সব কথা কিছুই জানাও নি।"

'ও-সব টা যে কি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে তাঁহার কোথায় যেন একটু ব্যথা লাগিতেছিল।

অনি মুখ তুলিয়া একবার বনবিহারীবাবুর দিকে চাহিল; চোখ

দুইটিতে কোনো প্রশ্নও ছিল না, উত্তরও ছিল না। তখনও বোধ হয় সে ভালরূপে বনবিহারীবাবুর জিজ্ঞাস্য বিষয় বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। পরক্ষণেই আবার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বেশ প্রকৃতিস্থ ভাবে বলিল—"কি কথা দাদা?"

"ওই যে"—বলিয়া বনবিহারী একটা ঢোক গিলিলেন। মনে দুর্ব্বলতার সঙ্কোচ আসিতেছিল—হয় তো অনির প্রাণে ব্যথা লাগিবে।

"ওঃ—আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী বুঝি?"

অনি একটু হাসিল। সে হাসিতে প্রসন্নতা বা ব্যথা কিছুই ছিল না;—নীরস বা রুক্ষও নয়।

বনবিহারীবাবু জানিতেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখের বা হাসি-কান্নার উপর অনির অদ্ভুত একটা আধিপত্য আছে। দুঃখ অনিকে বিচলিত করিতে পারে না। নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই পুনরায় বলিলেন—"হাঁ। তুমি যে বিধবা সে কথা কোনো দিন জানতেও পারিনি; তুমি নিজেও তো সে সম্বন্ধে কোনো দিন কোনো কথা আমাদের বলো নি।"

অনি অবিচলিত ভাবেই উত্তর দিল—"আপনারাও তো সে সম্বন্ধে কোনো দিন জিজ্ঞেস্ করেন নি, দাদা! বিনা কারণে অযাচিতভাবে নিজের দুঃখের কাহিনী মানুষ ব'লতে পারে না। পারলেও, আমি অন্ততঃ সেই 'পারা'টাকে ঘৃণা করি; ওতে হৃদয় ভিক্ষুক ও কাঙ্গাল হ'য়ে পড়ে। লোকেও হয় তো তার দুঃখে ব্যথা পেয়ে তাকে দয়া ক'রতে পারে; কিন্তু শ্রদ্ধা ক'রতে পারে না।"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই অনির মনে হইল—নিজের

দৈন্যের কথা জানাইয়াই সে মেজরের কাছে দয়ার ভিখারী হইয়াছিল; তবে তাঁহার কাছে নিজের এই সত্য পরিচয়টুকু সে গোপন করিয়াছিল কেন? অনি মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

অনিকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বনবিহারীবাবু একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"তবে থাক্। আমি অবশ্য সে জন্যে বিশেষ—"

"না দাদা, আপনার কাছে আমার সে সমীহের কোন কারণ নেই। যেখানে স্নেহের প্রতিষ্ঠা শিকড় গেড়েছে, সেখানে কি মানুষের আত্মাভিমানের বালাই থাকৃতে পারে? তবে আমার কথা আমিও ভাল ক'রে জানি না।—

সে আজ বারো বৎসর আগেকার কথা। তখন সুখ-দুঃখ বুঝ্‌বার ক্ষমতা আমার হ'য়েছিল কি না ব'ল্‌তে পারি না; তবে ভালো-মন্দ বোধ হয় কতকটা বুঝতুম। বাবা ছিলেন স্কুলের ইন্‌স্‌পেক্টর; তিনি তখন সিউড়িতে থাকৃতেন। বাবার শরীর অত্যন্ত ভেঙে প'ড়েছিল। হয় তো তিনি বুঝতেও পেরেছিলেন যে বেশী দিন আর বাঁচবেন না; তাই আমার বিয়ের জন্যে খুব তাড়াতাড়ি লেগে গেল তাঁর। আমার যিনি শ্বশুর হ'লেন, তাঁর সঙ্গে বাবার আগে থেকেই খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমি পূর্ব্বে তাঁকে অনেকবার আমাদের বাড়ী আস্‌তে দেখেছিলুম। তাঁর অবস্থা খুব ভাল ছিল; তাই ব'লে আমার গরীব বাপকে তিনি অশ্রদ্ধা করেন নি কখনো।

আমার যখন বিয়ে হ'ল, তখন ফাল্গুন মাস। বিয়ের কিছুদিন পরেই বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়লেন। তখন থেকেই আমাদের দুর্ভাগ্যের সূচনা হ'ল। বাবা চাকরী ছেড়ে দিয়ে

ইন্‌ভ্যালিড্‌ পেন্‌শন্‌ নিতে বাধ্য হ'লেন। পূরো বেতনের তিন ভাগের এক ভাগ বাবার পেন্‌শন্‌ মঞ্জুর হ'ল। অত কম আয়ে তখন যে আমাদের চ'লবে কেমন ক'রে, তাই ভেবে মা অস্থির হ'য়ে পড়ে'ছিলেন। জেলা-সহরের মধ্যে বহরমপুরে খরচ খুব কম প'ড়তো তখন। আমরাও বহরমপুরে গিয়ে বাসা ক'রলুম। বাবারও তাই ইচ্ছা ছিল; কারণ তাতে দেশের জমিজমাগুলো দেখার সুবিধেও ছিল—আর গঙ্গাতীর।"

"তোমরা বহরমপুরে থাক্‌তে বুঝি? আমার দেশও যে ওরই কাছাকাছি; নেহালিয়া—জিয়াগঞ্জের কাছেই। বহরমপুর কলেজে পূরো চার বৎসর প'ড়েছিলুম, অবশ্য শুধু আই-এস্‌সি। তোমাদের বাড়ীও কি বহরমপুরেই।"

"না। বাবা যতদিন অসুস্থ ছিলেন, ততদিন বহরমপুরেই ছিলুম আমরা। আমাদের বাড়ী ছিল—বহরমপুরের কয়েক মাইল পূর্ব্বে, ভাণ্ডারদহ বিলের পাশে চাঁদপুর বলে' একটা গ্রামে। কিন্তু দেশের বাড়ীতে আমরা থাক্‌তুম না। থাকবার কোন সম্বলও ছিল না। বাবার অসুখ যখন খুব বেশী, সেই সময়ই আমার শ্বশুর-মশায়ও মারা যান। সকলের কথা খুব ভাল ভাবে আমার মনে পড়ে না। তবে শ্বশুর-মশায়ের কথা কতকটা মনে পড়ে। খুব লম্বা-চওড়া পুরুষ ছিলেন তিনি; হঠাৎ দেখলে কাছে যেতে ভয় ক'রতো। আমার শাশুড়ী ছিলেন না বলে' মা দুঃখ ক'রেছিলেন,—ভেবেছিলেন বোধ হয় আমার কষ্ট হবে। কিন্তু আমার সেই তেজস্বী শ্বশুর আমায় এত স্নেহ ক'রতেন যে, আমায় সে অভাব তিনি একেবারেই জানতে দেন নি। শেষ সময়ে তিনি আমায় দেখ্‌বার জন্যে খুব ব্যস্ত হ'য়েছিলেন; কিন্তু বাবাও তখন

মৃত্যু-শয্যায় ; তাঁকে ফেলে যাওয়া হয় নি। কে জান্‌তো যে আমার শ্বশুর-মশায়েরও সেই শেষ-ডাক।”

অনির গলাটা একটু ভারি হইয়া আসিল। হয় তো তাহার চক্ষে তখন জল আসিয়াছিল। কিন্তু গাড়ীর ভিতরের অস্পষ্ট আলোকে বনবিহারীবাবু তাহা দেখিতে পাইলেন না।

“থাক অনু, যা হ’য়ে গেছে তা’ তো আর ফির্‌বার নয়। ও সব কথা ভেবে আর মিছে দুঃখকে ডেকে এনে লাভ কি বল ?”

“দুঃখ যেখানে বাসা পেতেছে, সেখানে আর দুঃখকে ডেকে আনতে হয় না দাদা। তারা আপনা-আপনি সার বেঁধে’ এসে বুকের ভিতর বাসা করে ; তাদের অবাধ গতিকে বাধা দেওয়া যায় না। বুকের মাটিকে ঝাঁঝরা ক’রে তারা মনের উপর এমন বড় বড় বল্মীক-পিণ্ড খাড়া ক’রে তোলে, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বভাবিক-গতি পর্য্যন্ত বাধা পেয়ে বন্ধ হ’য়ে যেতে চায়।”

“কিন্তু তাদের সেই বল্মীক-বাসাকে ভেঙে দেবার চেষ্টা ক’রতে হবে অনু ! ব্যথাকে চাপা দিয়ে রাখতেই হবে। নইলে প্রাণ যে ক্রমেই হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অসাড় হ’য়ে পড়’বে।”

“তাকে সরানোর তো কোন উপায় নেই দাদা। সে উই-ঢিপি ভেঙে দিলে, তার ভিতরের পিঁপড়েগুলো সারা বুকে ছড়িয়ে পড়ে’ তাকে ক্ষতবিক্ষত ক’রে তুল্‌বে। আবার নূতন জায়গায় নূতন ক’রে বাসা বাঁধবে ; পালাবে না। দুঃখ এসে জমে হুড়োহুড়ি ভিড় করে, কিন্তু যাবার বেলায় তারা তত সহজে যেতে চায় না। দুর্ভাগ্যের ক্রমই তাই দাদা। বাবা পক্ষাঘাতে অকর্ম্মণ্য হ’য়ে গেলেন ; তার ছ’মাস পরেই শ্বশুর মারা গেলেন। শ্বশুর-মশায়ের মৃত্যুর মাস-চারেক পরেই

আমি বিধবা হ'য়েছিলুম। বাবা সে শোক সহ্য ক'রতে না পেরে দু' মাসের মধ্যেই তাঁর সুখ-দুঃখের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে, আমাদের অসহায়া ক'রে চ'লে গেলেন। তার পর মা, দাদু একে একে গেলেন; একটুও যেন দেরী সইলো না কারো। আমার মনে হয়, এ বিপ্লবটা বোধ হয় ঘ'টলো শুধু আমার জন্যেই; নইলে—বাবা—"

অনির কথায় বনবিহারীবাবুর চোখে জল আসিতেছিল। আর্দ্রকণ্ঠে, অনির হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া, তিনি বলিলেন "ছিঃ অনু! ও কথা মনে ক'রো না, যা হ'বার তা' কেউ রোধ ক'রতে পারে না। ভাগ্যে যা আছে তা' ঘ'টবেই; তার জন্যে দায়ী কেউ নয় বোন।"

"তা' বুঝি; কিন্তু তবুও মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না দাদা। আমার স্বামী আমাকে বিয়ে ক'রে হয় তো একটী দিনের জন্যও মনে শান্তি পান নি। এ বিয়েতে তাঁর সম্পূর্ণ অমত ছিল; শ্বশুর-মশায় জোর ক'রেই বিয়ে দিয়েছিলেন—তাঁকে ত্যাজ্য-পুত্র ক'রবার ভয় দেখিয়ে। তখন আমি এ সব কথা ভাববার যোগ্যতা পাই নি; আমার বয়স তখন মাত্র এগারো-বারো বৎসর। কিন্তু এখন ভাবতে গেলে কেবল মনে হয়—মনের অত বড় অশান্তিটা সহ্য ক'রতে না পেরেই বোধ হয় তিনি মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন; নইলে যুদ্ধে যাবেন কেন? আর তাই থেকেই আমার বাবা, মা—সকলের জীবন শিথিল হ'য়ে পড়ে'ছিল। উঃ, বাবা যেদিন তাঁর বন্ধু ব্রাউন সাহেবের কাছ থেকে জামাইএর মৃত্যু-সংবাদ পেলেন, সেদিন হঠাৎ বাবার কি অবস্থা যে হ'য়ে পড়'লো! তার পর দেখতে দেখতে সবই যেন—"

অনির কথা শেষ না হইতেই গাড়ী বাসার সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল। বনবিহারীবাবু এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে অনির কথাই শুনিতেছিলেন। শব্দ পাইয়া সুলতা তাড়াতাড়ি দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; অভিমানে মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া রাখিলেও, চাপা হাসির আভাটুকু লুকাইতে পারে নাই।

১৫

গোপীমোহনের বিশেষ আগ্রহ ও সহৃদয়তা থাকিলেও মোক্ষদার ব্যবহার তেজস্বিনী অনিকে বিশেষ ব্যথিত করিয়াছিল। মনে মনে যথেষ্ট বোঝাপড়া করিয়াও সে পিসিমার বাসায় আশ্রয় লইবার আকাঙ্ক্ষাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না; কোনো মেস্ কিম্বা মহিলা নিবাসে থাকাই স্থির করিল। বনবিহারীবাবু পূর্ব্ব হইতেই সে কথা বলিয়াছিলেন। বিপন্ন অবস্থায় আত্মীয়ের আশ্রয়ে না থাকাই ভালো।

বনবিহারীবাবু নিজেই চেষ্টা করিয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের একটী মহিলা-নিবাসে অনির থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। ব্যয়বাহুল্যের ভয়ে অনি প্রথমে সেখানে থাকিতে আপত্তি করিয়াছিল; কিন্তু বনবিহারীবাবু তাহা মানিলেন না। অন্ততঃ যতদিন সে কোন কাজ-কর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া উঠিতে না পারে, ততদিন ঋণ বলিয়াও তাঁহার নিকট হইতে মাসিক খরচটা লইবার জন্য তিনি নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া অনিকে রাজী করিলেন।

কাহারো নিকট সাহায্য গ্রহণ করা অনির স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল; বিশেষতঃ মেজরের সাহায্য গ্রহণের তীব্র বিষ তাহার প্রাণের

শিরা-উপশিরায় রক্তপ্রবাহ বন্ধ করিয়া সে সাহস ও প্রবৃত্তিকে যেন আরো অসাড় করিয়া তুলিয়াছিল। তথাপি বনবিহারীবাবুর আন্তরিকতা ও নিজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া অনি তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। দাদামহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার শেষ মাসের পেন্‌শনের যে কয়েকটী টাকা মাত্র অনি তাহার নিঃসঙ্গ জীবন-যাত্রার পাথেয় স্বরূপ পাইয়াছিল, তাহাও তখন প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল।

* * * *

মাত্র সাত দিনের অবকাশ লইয়া বনবিহারীবাবু কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা-সাক্ষাতের হিড়িকে ও কায-কর্ম্মের ভিড়ে এই ক্ষুদ্র অবসরটুকু এরূপ অলক্ষ্যে কাটিয়া গেল যে বনবিহারীবাবু ও সুলতা কেহই তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অনিকে মেসে উঠাইয়া দিয়া ও তাহার নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি গুছাইয়া দিয়া, তাঁহারা যখন অদ্যই ডেরাডুন্ এক্সপ্রেসে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার কথা জানাইয়া অনির নিকট বিদায় চাহিলেন, তখন সুলতার চোখের জল ও অনির বিহ্বল দৃষ্টি যেন সেই ছুটি-শেষের বিচ্ছেদ-বেদনাকে ঘনাইয়া তুলিল।

বনবিহারীবাবুর পায়ে মাথা ঠেকাইয়া অনি তাঁহাকে প্রণাম করিল। এই বনবিহারীবাবুর সহিত যেদিন তাহার প্রথম পরিচয় হয়, সেই দিন হইতেই সে তাঁহার সরল প্রকৃতিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার বাচাল ও কৌতুকপ্রিয় প্রকৃতির অন্তরের এই বিরাট মনুষ্যত্বকে তখন অনি এরূপ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। মেজরের তুলনায় বনবিহারীবাবুর যে

সকল চপলতা ও দুরন্তপনাকে অনি একদিন অবহেলার চক্ষে দেখিয়াছিল, আজ সেগুলিকে তাঁহার সরল হৃদয়ের সমৃদ্ধি বলিয়া শ্রদ্ধা না করিয়া পারিল না। আজ অনির সারা অন্তর বনবিহারী-বাবুর চরণে ভক্তিনত হইয়া পড়িল।

সুলতার মুখখানির পানে চাহিয়া অনির ব্যথিত হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। সুলতা তাহার পদধূলি লইতেই অনি তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। এই নিতান্ত সরলা বালিকার স্নেহময় বন্ধুত্ব সম্পদ সেই সুদূর প্রবাসে তাহার জীবন-মরুভূমিকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়া দিয়াছিল। অনি তাহার উত্তপ্ত শূন্য জীবনে সুলতাকে যেন হঠাৎ একটা সুশীতল ছায়াবীথির মত পাইয়াছিল। কিন্তু আজ সেই সুলতাকেও আবার ছাড়িয়া দিতে হইবে;—কে জানে, সেই ছাড়াই চিরদিনের মত কি না! এ কথা ভাবিতেই অনির চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। আরো নিবিড়ভাবে সুলতার মুখখানিকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া আর্দ্রকণ্ঠে অনি বলিল—"লতি! আমায় ভুলে' যাবি না তো বোন্!"

সুলতার ঠোঁট দু'খানি তখন কাঁপিতেছিল। অনির বুকের মধ্যে মুখখানাকে তেমনি ভাবেই গুঁজিয়া রাখিয়া উদ্গত কান্নাকে চাপিয়া লতি বলিল—"দিদি, তুমি আর যাবে না—আমাদের ওখানে?"

"নিশ্চয়ই যাবো"—অনি তাহার চিবুক ধরিয়া একটু নাড়া দিয়া বলিল—"তোর ছেলের অন্ন-প্রাশনে।"

লজ্জিতা সুলতা অনিকে একটু ধাক্কা দিয়া চাপা ভর্ৎসনার ইঙ্গিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল—"যাও! ভারি দুষ্টু মেয়ে! আমার ছেলে হবে না; আমি চাই নে।"

দুঃখের মধ্যেও অনি একটু না হাসিয়া পারিল না, এই বোকা মেয়েটীর সরল ভাব দেখিয়া। সুলতার গাল দুইটীকে ঈষৎ টিপিয়া দিয়া বলিল—"তা না হ'লে যে বাঁধন আল্‌গা হ'য়ে যাবার ভয় আছে! চা'স্—নিশ্চয়ই চা'স্।"

"সে ভয় আমার এক ফোঁটাও নেই। তুমিই তো ব'লেছিলে, ভক্তির ঘরে ভয়কে বাসা বাঁধ্‌তে দিতে নেই।"

"ব'ল্‌লে কি হয় লতি! ঐ দু'টো জিনিষ গোড়াগুড়ি এমন তাল পাকিয়ে জড়িয়ে থাকে যে, ভয়কে ভক্তি থেকে আলাদা ক'রে বেছে' ফেলা ভারি কঠিন।"

"তা হোক্ গিয়ে! তার ভয়ে আমি 'মা' হ'তে চাচ্ছি কি না! আমার ছেলের দরকার নেই; তুমি যাবে কি না বল?"

"যাবো; নিশ্চয়ই যাবো লতি!" বলিয়া অনি সুলতার মুখখানিকে গালের উপর চাপিয়া ধরিয়া কাণে কাণে বলিল—"পাগলি! মেয়েরা কি 'মা' হ'তে চায় শুধু 'ছেলের মা' হবার লোভে? স্বামীর আত্মার একটা টুক্‌রোকে নিজের রক্ত-মাংস দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে, একবারে নিজস্ব ক'রে বুকে পাবার লোভই তা'দের মা হবার জন্যে পাগল ক'রে তোলে, তা জানিস্।"

অনির কথা খুব পরিষ্কার ভাবে না বুঝিলেও, সুলতা যতখানি বুঝিল—তাহারই অনুভূতি তাহার সুন্দর মুখখানিকে নিমেষে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

রাত্রি দশটায় ডেরাডুন্ এক্সপ্রেস্ ছাড়িয়া যায়। তখন প্রায় সাড়ে-সাতটা বাজে দেখিয়া বনবিহারীবাবু সুলতাকে তাড়াতাড়ি যাইবার কথা বলিলেন। জিনিষপত্র সবই ভবানীপুরে পড়িয়া আছে, তখনো কিছুই গুছাইয়া লওয়া হয় নাই।

অনি ও সুলতা আসন্ন বিচ্ছেদের দুঃখেও কথাবার্ত্তায় একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সহসা তাড়া পাইয়া যেন পরস্পরের হৃদয় আবার ব্যথিত হইয়া উঠিল।

দারোয়ান জানাইল যে ট্যাক্সি ডাকা হইয়াছে। অনি, সুলতা ও বনবিহারীবাবু নীচে নামিয়া আসিলেন। অনির মনটা তখন বেদনার ভারে আরো নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। সুলতাকে আর একবার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া অনি তাহার সীমন্ত চুম্বন করিল; মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না। উভয়েরই চক্ষু তখন নীরব-বেদনার অশ্রুতে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

লতিকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া অনি মুহূর্ত্তে নিজেকে সংযত করিয়া ফেলিল। অশ্রু তাহারই জীবনের সাথী; অপরকে সে তাহার অংশ পাইতে দিবে কেন!

বনবিহারীবাবু জোর করিয়া অনির হাতে কয়েকখানি নোট গুঁজিয়া দিলেন। ইচ্ছা সত্ত্বেও অনি তাহাতে আপত্তি করিতে পারিল না। এই স্নেহের দাবীকে উপেক্ষা করিবার সাহস তাহার ছিল না।

ট্যাক্সি চলিয়া গেলে অনি নিশ্চল ভাবে তাঁহাদের পথ পানে চাহিয়া রহিল। আজ অনির মনে হইতে লাগিল যে পশ্চিমের সঙ্গে তাহার সুদীর্ঘ বারো বৎসরের সম্বন্ধ বোধ হয় এই বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই ছাড়িয়া গেল—শুধু কতকগুলি কান্না-হাসির জীর্ণ স্মৃতির স্তূপ তাহার মনের উপর বসাইয়া দিয়া। আজ মেজরের কথা মনে পড়িয়াও তাহার চোখে জল আসিল। সেই বাংলো, সেই শিউকিষণ ও ভুগ্‌লু;—একজনের ক্ষণিক দুর্ব্বলতার

ঝাপ্টায়, সব কিছু হইতেই চিরদিনের মত সে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

বনবিহারীবাবুর উদাস মনটাও বোধ হয় তখন একটু কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তাই অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া—হাতের রুমালখানি নাড়িতে নাড়িতে তিনি গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিলেন—

নিত্য তোমার ভাঙা-গড়া,
সৃষ্টি-খেলার আগা-গোড়া।
হে নটরাজ, নৃত্য তোমার
বুঝেও বুঝি না।
কান্না-হাসির ছন্দে-ভরা
তোমার আঙিনা॥

বনবিহারীবাবু ও সুলতা চলিয়া যাওয়ার পর অনি অনেকক্ষণ নিঝুম ভাবে ফটকের কাছেই দাঁড়াইয়া রহিল। এতদিন গোপনে তাহার বুকের ভিতর যে ভালবাসা নীরবে আপনার অস্তিত্বকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, আজ পশ্চিমের সঙ্গে সম্বন্ধের সকল বাঁধন নিঃশেষে কাটিয়া যাইতেই যেন সেই প্রচ্ছন্ন ভালবাসা মূর্ত্ত হইয়া তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। বিশেষতঃ, মেজরের স্মৃতিতেই যেন তাহার সারা অন্তর জুড়িয়া আজ হাহাকার উঠিতেছিল; আর অনি শুধু চোখ রাঙাইয়া তাহার মনকে সংযত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল।

উপরে আসিয়া অনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। তাহার বুকের ভিতর একটা ব্যথিত ক্রন্দন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যেই যেন মেজরের কর্ম্মঠ ও উৎসাহী প্রাণটা সম্পূর্ণ অসাড় ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। একটা মর্ম্মান্তিক বেদনা তাঁহার এই চৌত্রিশ বৎসর বয়সের উদ্দাম জীবনকে এরূপ জীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল যে, মেজরকে দেখিয়া এখন আর সহসা তাঁহার বয়স অনুমান করা যায় না। এই কয়দিন তিনি বাহিরের ডাক ও হাসপাতালের কার্য্যে পর্য্যন্ত বাহির হন নাই। বয় ও শিউকিষণ্ নিয়মিত ভাবে তাঁহার সমস্ত কার্য্যই করিয়া যাইতেছিল; কিন্তু তিনি সে সব দৈনন্দিন কার্য্যের গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া এমন একটা নিভৃত কোণে নিজেকে টানিয়া রাখিয়াছিলেন যে, বেচারা চাকর ও বেয়ারাদের সমস্ত শক্তির নাগালকে তাহা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এখন আর পূর্ব্বের মত তাহারা যখন তখন মেজরের সম্মুখে আসিতে সাহস করিত না। মেজরও সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন—পাছে তাঁহার দুর্ব্বলতা বিশ্বের চক্ষে ধরা পড়িয়া যায়।

যে গ্রহ একদিন তাহার খেয়ালের পথে অবাধ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছিল—জগতের সকল অমঙ্গল ও বাধাবিঘ্নকে নিজের শক্তির প্রাবল্যে উপেক্ষা করিয়া, সহসা একটা প্রলয়ের ঝঞ্ঝায় সে যখন কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে তখন তাহার সেই দুর্জ্জয় আত্মাভিমান ও খেয়ালের শক্তির নেশা এক মুহূর্ত্তে ছুটিয়া যায়। সেই ভীষণ পতনের হাত হইতে সে তখন নিজেকেও ফিরাইতে পারে না; তাহারই উপেক্ষিত নিতান্ত ক্ষুদ্র উপগ্রহদের আকর্ষণকেও হাত বাড়াইয়া নাগাল পায় না। খেয়ালের নেশা যখন দুকূল ছাপাইয়া তীরের বন-উপবন সব ভাঙ্গিয়া লইয়া বহিতেছিল, তখন মেজর

চাহিয়াছিলেন তাঁহার জীবনের সেই মত্ততাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে। কিন্তু সেদিন তিনি ভাবিতেও পারেন নাই যে, সেই সকল বন-উপবনই একদিন স্রোতের মোহনায় জমা হইয়া তাহার গতিরোধ করিয়া দিবে—সমস্ত প্রবাহ বদ্ধ-বেগ হইয়া তাহার অন্তর পর্য্যন্ত পচিয়া উঠিবে। বাসনার আগুনকে জ্বালাইয়া তুলিয়া যে উপভোগের যজ্ঞে তিনি কর্ত্তব্যের বিধি-নিষেধকে পর্য্যন্ত শাখাসহ ছিঁড়িয়া লইয়া আহুতি দিয়াছিলেন, সেই আগুনে যে পতঙ্গের মত শেষে নিজেকেই পূর্ণাহুতি দিতে হইবে, তাহা মেজর কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

এখন আর মেজর বড় একটা বাহির হইতেন না। অধিকাংশ সময়ই নিজের শয়ন-কক্ষখানিকে আশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। লাইব্রেরি, অনির নির্দ্দিষ্ট ঘরখানি, এমন কি, হল-ঘরেরও সেই অংশটুকু পর্য্যন্ত তিনি এড়াইয়া চলিবার জন্য সর্ব্বদা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। সেই অচেতন জড় পদার্থগুলিকে দেখিয়াও যেন তাঁহার একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইত। স্থবিরের মত বদ্ধ ঘরে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে যখন তাঁহার প্রাণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া উঠিত, মেজর কোনরূপে নিজেকে টানিয়া আনিতেন বারান্দা কিংবা পশ্চাতের বাগানের একটি কোণে। কিন্তু সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। নিজের যে দুর্ব্বলতা তিনি এতকাল জানিতে পারেন নাই, সেই দুর্ব্বলতা যেদিন হইতে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে স্বরূপ লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই দিন হইতেই বহির্জ্জগতের একটা ক্রূর বিদ্রূপ-হাসি যেন মেজরের সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া বাজিত।

৯৫

তখন সন্ধ্যা। পৃথিবীর যে বুক এতক্ষণ আলোকে ভরিয়া ছিল, গোধূলির ম্লান হাসি যেন সহসা কোন গোপন দুর্ব্বলতাকে তাহার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে লজ্জায় রাঙা করিয়া তুলিয়াছিল; পরক্ষণেই, সেই লজ্জার আভাটুকুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আনন্দময় জীবনের উজ্জ্বল আলোকরাশি যেন ভয়ে আত্ম-গোপন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন শুধু একটা বিষাদের কালিমা ভরিয়া উঠিয়াছে। সেখানে হাসি নাই, আলো নাই; দিনের সব পথ, সব সৌন্দর্য্য যেন মুহূর্ত্তে ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছে। মেজর জানালার পাশে কৌচটার উপর পড়িয়া বাগানের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। কামিনী গাছটার কোলে কাঁঠালি চাঁপার প্রকাণ্ড ঝোপটা—যাহার পাতাগুলি এতক্ষণ আলোকে ঝল্‌মল্‌ করিয়া দুলিতেছিল, সেটা যেন তখন একটা নির্জীব অন্ধকার স্তূপের মত দাঁড়াইয়া আছে। দিনের আলোয় খুঁজিলে যাহার কচি পাতার বুকে গন্ধে ভরা হাজার ফুলের কলি মিলিত, এখনকার বীভৎস রূপ দেখিয়া তাহাকে ভালভাবে আর চেনাই যায় না। কিন্তু এই অন্ধকারে তাহার রূপের সমাধি হইয়া গেলেও কি তাহার বুকের মধ্যে লুকানো সেই সুরভি-উৎস মরিয়া গিয়াছে? না;—বাতাসে এখনো তাহার ভাষা হয় তো শোনা যায়। সে মরে নাই, মরিবে না। অন্ধকার তাহার চোখ বাঁধিয়া পথরোধ করিয়াছে; কিন্তু বাতাস তাহার নিঃশ্বাসের গতিরোধ করিতে পারে নাই। মেজরও বাঁচিয়া আছে—সে বাঁচিবে, যে অন্ধকার সহসা তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে শ্বাসরোধ করিতে দিবে না।

মেজর বসিয়া বসিয়া নিজের জীবনের কথা ভাবিতে-ছিলেন। 'জন্মের আগেকার কোনো ইতিহাস যার নেই, মৃত্যুর পরে যা' নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যাবে, তার পিছনে মানুষ এত সামাজিকতা, এত বিধি-নিষেধ গড়ে' তার দম বন্ধ ক'রে তুলেছে কেন? জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পথে আপনা আপনি যা চলে' আসে, তার গতিরোধ ক'রতে নতুন ধারা সৃষ্টি ক'রে নিজেদের হাত-পা এমনভাবে শিকল দিয়ে বাঁধবার কি দরকার পড়ে'ছিল মানুষের! চোখ, কাণ, নাক, মুখ প্রত্যেক অঙ্গ মানুষের জন্মের সাথেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে—তাকে ভোগ ক'র্‌বার জন্যে। কল্পনার সৃষ্টিতে 'মরালিটী'র বাঁধন দিয়ে যারা সেই জীবনের হাত-পা'কে বেঁধে ভোগের পেয়ালা লোহার আবরণে ঢেকে ফেলেছে, তারা শুধু নিজেরা অক্ষম ব'লেই নিজেদের সেই তৃষ্ণার্ত্ত জীবনের পিপাসা মিটাবার অক্ষমতায় তার গলায় ছুরি মেরে, তার হাহাকারকে বন্ধ ক'রে ফেলবার চেষ্টা ক'রেছে। কিন্তু যার সে পথ ব'য়ে চ'লবার ক্ষমতা আছে, সে কেন নিজে সেই সব অকর্ম্মণ্য-মস্তিষ্কের খেয়ালগুলোকে হাতে-পায়ে জড়িয়ে নিয়ে নিজেকে বিশ্বের সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত ক'রবে? মানুষ জন্মেছে, সে মর'বেও। কিন্তু সেই জন্মানো আর মরার মাঝখানে তার যতটুকু বেঁচে থাকা, সেটাকেও সে মরবার আগেই মেরে ফেল্‌বে কেন? যে মুমূর্ষু—সেও জল চায়, তারও পিপাসার ব্যাকুলতা আছে, অন্ততঃ যতক্ষণ বাঁচ্‌বার জগতের শেষ নিঃশ্বাসটুকু তার বুকের পথকে মুক্ত ক'রে রেখেছে। মানুষ যে কল্পনার দড়ি তৈরী ক'রে নিজেকে বেঁধে রাখ্‌তে চায়, তা'র বাঁধনের ভিতরে আমরা আপনা-আপনি হাত বাড়িয়ে দেবো কেন? প্রকৃতির

বুকে যে, যে অধিকার নিয়ে জন্মেছে, সে অধিকার তার নিজস্ব—সে তা' ভোগদখল কর্‌বেই। কিন্তু—

ঐ 'কিন্তুর' গণ্ডীটা মেজর কোন মতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। যেখানে নিজের স্বচ্ছন্দ অধিকার টুকুকে সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া আমরা পাইতে চাই, সেখানে পরেরও অধিকার আছে—তাহাদের প্রত্যেকের স্বচ্ছন্দ নিজস্ব অধিকার। জগতের দিক হইতে প্রত্যেকের সেই স্বচ্ছন্দ অধিকারকে বাঁচাইয়া চলিতে হইলেই, নিজের অধিকারের গণ্ডী মাপিয়া লইতে হইবে —সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া। সমাজ—বিধি-নিষেধ, এ সকলই সেই অধিকারের মাপকাঠি। যে মাপকাঠি সমস্ত দুনিয়ার আসর দখল করিয়া বসিয়াছে, আজ সহসা তাহাকে ভাঙিতে গেলে সেখানে বিপ্লব ঘটিবেই। সংহত শক্তির আঘাতে নিজেকেই ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ফিরিতে হইবে—শুধু পরাজয়ের গ্লানিতে নিজের অন্তরকেই বোঝাই করিয়া। সেই গ্লানির কালিমায় নিজস্ব অধিকারের শেষ আলোক-কণাটুকু পর্য্যন্ত কালো হইয়া উঠিবে। আলোর সম্মুখ হইতে যে দুর্ব্বল জীবাণু কোন্ নিভৃত কোণে আত্মগোপন করিয়া ছিল, আজ তাহা দুর্ব্বলতার অবসর লইয়া, নিমেষে একটা বিষাক্ত ঘায়ের মত সমস্ত অন্তর ছাইয়া ফেলিয়াছে। যাহাকে একদিন অধিকারের দাবী বলিয়া পতাকার মত তুলিয়া ধরিয়াছিলাম, আজ তাহা গ্লানির পাথর হইয়া বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। সেখানে আলো নাই, তৃপ্তি নাই, পথ নাই ;—শুধু গ্লানির হাহাকার, ক্ষতের ব্যথা!

দাঁতে দাঁত চাপিয়া মেজর হাতের উপর মাথা রাখিয়া কপালের উপরকার চুলগুলিকে আস্তে আস্তে টানিতেছিলেন।

বয় ঘরে আসিয়া আলো জ্বলিয়া দিতেই মেজরের খেয়াল হইল। তিনি সেই অবস্থাতেই গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কোন্ হ্যায়।”

সন্ত্রস্ত বালক কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ মেজরের মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। অতি নিম্নস্বরে সভয়ে কহিল—“হাম্মে—হুজর! ভগ্লু।”

মেজর কটাক্ষে ভগ্লুর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরেই বলিলেন—“পেগ্ লেয়াও—পেগ্—সরাব।”

ইদানীং মেজর সুরাপাত্রের মধ্যে শান্তির সন্ধান খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। দুশ্চিন্তার অনুশোচনা ও অশান্তির গ্লানিতে যখন তাঁহার মনটা উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, মদ্যপানে তাহার বোধশক্তিকে উন্মত্ত করিয়া দিয়া তিনি অশান্তির গুরুভার ঝাড়িয়া ফেলিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। জীবনের পাত্র যখন কাণায় কাণায় বিষাক্ত হইয়া উঠে, তখন মানুষ মৃত্যুকে বরণ করিয়া শান্তি পাইতে চায়, অথচ নিজেকে ঘিরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার লোভও সে ছাড়িতে পারে না, তাই এইরূপ একটা ভীষণতম আশ্রয়ের মধ্যেই নিজেকে দাঁড় করাইয়া সে ঐ মরিবার চিন্তাটুকুকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে চায়। মেজর তাঁহার জীবনের সব কিছুকে ঐ সুরার পাত্রে ডুবাইয়া দিয়া হাল্কা হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবসাদের সুযোগ লইয়া যখনই দুশ্চিন্তা ও অশান্তি মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিত, তখনই নীতি ও শান্তির বিরুদ্ধে মেজর নিজেও এই দারুণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেন।

বেচারা ভগ্‌লু বোতল ও পেয়ালা আনিয়া মেজরের সম্মুখে টিপয়ের উপর সাজাইয়া দিল। এই মদ্যপানের অধ্যায়টা তাহার নিকট বিশেষ ভীতিপ্রদ বলিয়া মনে হইত। যাহা অস্বাভাবিক, তাহা শিশুর প্রাণকে ভীতিচঞ্চল করিয়া তোলে। বিশেষতঃ তাহার সুদীর্ঘ দুই বৎসরের কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতায় কথনো মেজরকে এইরূপ অবস্থায় সে দেখে নাই।

মেজরের চা খাইবার সময় হইয়াছে দেখিয়া বয় ভয়ে ভয়ে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া পুনরায় অতি নিম্নস্বরে বলিল—"হুজুর, চা রোটি লেয়ামে—"

মেজর একটা পেগ মুখে লাগাইয়া টানা অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"নেই—"

সন্ত্রস্ত বালক-ভৃত্য ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মেজরের শাসনকে যথেষ্ট ভয় করিয়া চলিলেও মাঝে মাঝে প্রভুর নিকট ভগ্‌লু যে আদর পাইত, তাহার আনন্দ সে শাসন-ভীতিকে ছাপাইয়া উঠিয়া তাহার তরুণ বুকখানাকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিত। কিন্তু এখন শাসনের ভয় শিথিল হইয়া আসিলেও, বঞ্চিত হওয়ার অভিমান ও ব্যথা তাহার কচি ঠোঁট দু'খানিকে যেন কান্নার চাপে ফুলাইয়া তোলে। সে কাঁদিতে পারে না, হয় তো তাহার ভৃত্য-জীবন আপনার পাওনার সীমা বুঝিতে শিখিয়াছে। ইহা অপেক্ষা সেই শাসনের ভয়ই যে তাহার ভাল ছিল। সে ভয়ের মধ্য দিয়া ভৃত্য তাহার প্রভুকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু এই শাসনের শিথিলতার ভিতর দিয়া প্রভু যে বিকৃত রূপ লইয়া ভৃত্যের সম্মুখে দাঁড়ান, তাহা দেখিয়া ভৃত্যের মন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে; তাহার শ্রদ্ধা উপিয়া যায়।

হাতের সুরা পাত্রটি এক চুমুকে নিঃশেষিত করিয়া মেজর কি বলিবার ইচ্ছায় একবার বয়ের উদ্দেশে ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু ভগ্‌লু তখন বাহির হইয়া গিয়াছে।

মুহূর্ত্তে কি ভাবিয়া লইয়াই মেজর উঠিয়া দাঁড়াইলেন; মনের অবস্থাটা বোধ হয় হঠাৎ একটু বদলাইয়া গেল। ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া মেজর শান্তকণ্ঠে ডাকিলেন—"ভগ্‌লু!"

ভগ্‌লু ছুটিয়া উপরে আসিল। অনেক দিন পরে যেন, বালক তাহার প্রভুর আহ্বানের মধ্যে সেই পূর্ব্ব স্নেহের রেশটুকু খুঁজিয়া পাইল।

ভগ্‌লু নিকটে আসিলে, মেজর তাহার মাথার উপর সস্নেহে নিজের বাম-হাতখানি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগ্‌লু, তোর মায়িজী তোকে কোন চিট্টি-উট্টি লেখে নি?"

ঈষৎ ম্লান হইয়া মেজরের মুখপানে চাহিয়া বয় বলিল—"নেই হুজুর। মায়িজী তো হাম্‌কো ছোড়কে গিয়া। একদম্ মুল্লুক্ চলা গিয়া……।"

বালকের কচি বুকখানি একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাসে দুলিয়া উঠিল।

"মায়িজীর জন্তে তোর মনে খুব কষ্ট হয়, না—রে ভগ্‌লু? তুই তার সঙ্গে গেলি না কেন?"

মেজর ভগ্‌লুর মুখের দিকে একবার চাহিলেন। বালকের স্বচ্ছ চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

ভগ্‌লু মুখখানি মাটির দিকে নামাইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"মায়িজী গরীব হ্যায় হুজুর; ওহি বাস্তে সাথমে নেই লে গিয়া!"

দুই হাতে রেলিংটাকে ধরিয়া মেজর আকাশের পানে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার আকস্মিক অন্যমনস্কতাটুকু ভগ্‌লুর চোখেও ধরা পড়িল।

অনির দেশ সম্বন্ধে, মেজর কোনো দিনই তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। মুল্লুক বলিতে—সেই বিস্তীর্ণ বাংলা দেশ। কে তাহাকে চেনে সেখানে; কে কাহার খোঁজ রাখে!

ভগ্‌লুকে বিদায় দিয়া মেজর আবার ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার মনটা তখন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যেন পুরাতন কোনো একটা স্মৃতিকে বারবার আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছিল। আর তাহারই ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল হইয়া অনির মুখখানি তাঁহার বুকের মধ্যে উঁকি মারিতেছিল। অনির সন্ধানের জন্য মেজর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

১৭

যে ব্যথা লইয়া অনি মেজরের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, বনবিহারীবাবু ও সুলতার সাহচর্য্যে সে তাহার অনেকখানি সহিয়া লইয়াছিল। সুলতার সরল ব্যবহার ও অকৃত্রিম বন্ধুত্ব তাহাকে শূন্য জীবন বহন করিবার মত একটা অবলম্বন দিয়াছিল। কিন্তু এই মহিলা-নিবাসের অপরিচিত গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া যেদিন সুলতা ও বনবিহারীবাবু তাহার নিকট বিদায় লইলেন, সেইদিন হইতে অনির রিক্ত-জীবনের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত যেন আবার অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। যে-কোনো দুঃখকে বুক পাতিয়া সহ্য করিবার মত একটা দৃঢ়তা অনির চরিত্রে ছিল, কিন্তু তাহা সেই

সর্ব্বস্ব-হারানোর ব্যথায় আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। অনির প্রকৃতি অতি স্নিগ্ধ, মিশুক ও সঙ্গীপ্রিয় ছিল, কিন্তু এখন তাহা এত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে আর সহসা কাহারো সহিত আলাপ করিতে পারিত না। মেসের যে সকল মহিলা তাহার সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছেন, সে অযথা তাঁহাদিগকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সর্ব্বদাই মনে হইত—সেই পাপস্পর্শ, যাহা তাহাকে নিঃস্ব করিয়াছে, হয় তো এখনো তাহার সারা মুখে কুৎসিত পোড়া-দাগের মত লাগিয়া আছে; যে-কেহ তাহার মুখ পানে চাহিলেই বুঝি সেই নিতান্ত হীন দারিদ্র্য ধরিয়া ফেলিবে। একটা মিথ্যা আতঙ্ক তাহার জীবনের স্বচ্ছন্দগতিকে পথ-ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মহিলাদের মধ্যে অনেকেই ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, অনি তাহার জীবিকা অন্বেষণে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবার কথা অনেকবার ভাবিয়াছে, কিন্তু ঐ দুর্ব্বলতা এরূপ ভাবেই তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া দিয়াছিল যে, সে কোন রূপেই তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া আপনার কথা বলিতে পারিত না। নিজের সমস্ত বিবেক-বুদ্ধি দিয়া অনি সহস্রবার আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে—'এ শুধু তাহার অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস; সে কায়মনোবাক্যে আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে; তবে কেন অনাগত পাপের বোঝা তাহারই বুকে চাপিয়া বসিবে! সে যাহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না, তাহার অজ্ঞাতে যে পাপ জীবনের উপর ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে,—সে পাপ কি তাহার?' কিন্তু পরক্ষণেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের স্রোতে অনির সে আত্মপ্রবোধ ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার রিক্ত-জীবন আবার হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে;

আবার সেই বুকভাঙা নিদারুণ আর্ত্তনাদ তাহার সারা প্রাণ জুড়িয়া বসে।

মেজরের উপর অনির অন্তর ঘৃণায় ভরিয়া গিয়াছে। তাঁহার চিন্তাটুকুর বিরুদ্ধেও অনির মন বিদ্রোহ করিয়া উঠে। অথচ অনি মেজরকে অভিসম্পাত করিতে গিয়াও ব্যথিত হইয়া পড়ে। নিজের সেই ব্যথার মধ্যেও যে কিসের একটা তৃপ্তি আছে, তাহা সে ভাবিয়া উঠিতে পারে না। অনি যখনই নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখনই লজ্জায় তাহার সারা অন্তর রাঙিয়া উঠিয়াছে।

মহিলা-নিবাসে যে কয়েকজন কর্ম্মী ও দেশসেবিকা আছেন, মঞ্জিষ্ঠা দেবী তাঁহাদের অন্যতমা ও প্রধানতমা। সভা-সমিতি, খদ্দর-প্রচার প্রভৃতি কার্য্যে ইনি প্রায় আঠারো ঘণ্টাই বাহিরে থাকেন। মাত্র দুইবেলা খাওয়ার সময় ও রাত্রে বিশ্রামের সময় ভিন্ন মঞ্জিষ্ঠা দেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যে ছয়-সাত ঘণ্টা মাত্র তিনি মহিলা-নিবাসে থাকেন, তাঁহার স্বভাব-মুখরতা সারা বাড়ীখানিকে এমন সজীব করিয়া রাখে যে, তাঁহার অনুপস্থিতি কালেও সেই অস্তিত্বের জমক মেসের ঘরে ঘরে ফিরিয়া বেড়ায়। কর্ম্মী হিসাবে মঞ্জিষ্ঠা দেবীর যেমন নাম আছে, অবিশ্রান্ত কথা বলিবার যোগ্যতাও তাঁহার তদপেক্ষা ন্যূন নয়। ঐ আহার ও বিশ্রাম সময়টুকুর মধ্যেই অনর্গল বকিয়া বকিয়া নিজের সারা দিনের কাজের হিসাব, কৈফিয়ৎ ও জবাবদিহি না করিতে পারিলে তিনি শান্তি পান না; তাহাতে অপরের আগ্রহ থাক আর নাই থাক। দৈনন্দিন কার্য্য সারিয়া তাঁহার মেসে ফিরিতে

প্রায়ই রাত্রি নয়টা, দশটা বাজে। কিন্তু যখন ফিরিয়া আসেন, তখন এক দিকে যেমন সারা দিনের প্রাণপাত পরিশ্রমে শক্তি অনেকটা হ্রাস হইয়া আসে, অপর দিকে তেমনি দেশ-বিদেশে সভা-সমিতি প্রভৃতির খবরে তাঁহার ফ্রী প্রেস বোঝাই হইয়া উঠে। মেসের প্রত্যেক ঘরে সংবাদপত্রের মত ফিরিয়া তাঁহার ঐ খবরের বোঝাগুলিকে যতক্ষণ তিনি খালি করিয়া ফেলিতে না পারেন, ততক্ষণ যেন মঞ্জিষ্ঠা দেবী কোনোমতেই সোয়াস্তি পান না।

অনির সাধারণ অভ্যর্থনার ত্রুটিটুকু লক্ষ্য করিয়া অধিকাংশ মহিলাই তাহার নিকট যাওয়া-আসা একপ্রকার বন্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু মঞ্জিষ্ঠার তালিকা হইতে তাহার ঘরখানি একদিনের জন্যও বাদ পড়ে নাই। প্রত্যহই নিয়মিত ভাবে তিনি, অন্ততঃ একবারও, দিনান্তের হিসাব লইয়া তাহার নিকট আসিতে ভুলিতেন না। অভ্যর্থনার ওজন যাচাই করিবার মত সময় ও প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। নিজের কাজের নেশা যাঁহাদিগকে মাতাল করিয়া রাখে, পরের ত্রুটি লইয়া চিন্তা করিবার অবসর তাঁহাদের হয় না।

নিজের অবিশ্রাম কাজ ও অনর্গল বক্তৃতার ভিতর দিয়াও মঞ্জিষ্ঠা দেবী অনির মৌন ও স্বল্পভাষী প্রকৃতিটিকে কয়েক দিনের আলাপেই চিনিয়া ফেলিলেন। অনির উন্নত জীবন ও মার্জ্জিত প্রকৃতি যে কোনো একটা গুরুভারে এমন মৌন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মঞ্জিষ্ঠার বুঝিতে বাকী রহিল না। অনিও কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝিল—এই ছিপ্‌ছিপে ও লম্বা মেয়েটি সার্ব্বজনীন 'মঞ্জিষ্ঠাদি' প্রতিষ্ঠার, কতখানি যোগ্য। মঞ্জিষ্ঠাদির স্বভাবের মধ্যে এতো স্নেহ ও পরদুঃখকাতরতা ছিল, যাহাতে

ঝি-চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া মেসের প্রত্যেক মহিলাটি পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে তাঁহার প্রাধান্য ও শাসন মানিয়া চলিত। হৃদয় জয় করিয়া মানুষ যে প্রতিষ্ঠা পায়, সেখানে বিদ্রোহ করিবার স্পৃহা থাকে না।

অন্ন-বস্ত্র সমস্যার মীমাংসা, গৃহশিল্পকে বাঁচাইয়া তোলা —দেশের দরিদ্র সম্প্রদায়কে উন্নত করা···ইত্যাদি লইয়া নেতাগণ কে কি বলিয়াছেন, মঞ্জিষ্ঠা—ডাইনিং হল্ হইতে আরম্ভ করিয়া মেসের উপরে-নীচে, বাহিরে—পথে-ঘাটে, লোকের বাড়ী বাড়ী—সেই মন্ত্র প্রচার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। মেসের সকলকে তিনি চর্‌কা কাটিতে আরম্ভ করাইয়াছিলেন। অনি তাহার কর্ম্মহীন অবসরের মধ্যে হঠাৎ নূতন একটা কাজ পাইয়া যেন সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই গ্রহণ করিয়াছিল। কলিকাতা সম্বন্ধে অনির বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়া সে কাজ-কর্ম্মের চেষ্টায় বড় একটা বাহির হইতে পারিত না; শুধু সংবাদ-পত্র ও অন্যের সাহায্য ব্যতীত তাহার আর উপায় ছিল না। কাজে-কাজেই সেই নির্জ্জন গৃহকোণে একমাত্র অবলম্বন চর্‌কা তাহার অনেকখানি সহায় হইয়া উঠিল। সারা দিনে অনি যে সূতা কাটে, তাহা মেসের অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ইহা মঞ্জিষ্ঠার দৃষ্টিকে তাহার প্রতি আরো অধিক আকর্ষণ করিল। মঞ্জিষ্ঠা অনির সূতা কাটার নিপুণতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া, প্রত্যহই সেই সূতার বাণ্ডিল লইয়া ছুটিতেন খাদি-প্রতিষ্ঠানে—তাহা দেখাইবার জন্য।

সেদিন রাত্রে মেসে ফিরিয়াই মঞ্জিষ্ঠা দেবী অনির ঘরের দিকে ছুটিলেন—তাহার সূতা সম্বন্ধে খাদি-প্রতিষ্ঠান ও সমিতির কর্ম্মিদের

অভিমত তাহাকে শুনাইবার জন্য। সে অভিমত হয় তো অনি অপেক্ষা তাঁহারই অধিক প্রীতিকর হইয়াছিল। কিন্তু সহসা ঘরে ঢুকিতেই অনির দুশ্চিন্তা-ম্লান মুখখানা তাঁহার উৎফুল্ল মনটাকে এমন একটা অতর্কিত ঝাঁকানি দিল যে, মঞ্জিষ্ঠাদির মনটা হঠাৎ সে আঘাতে একেবারে ঘোলা হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি অনির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"তুই কি ভাবিস্ ভাই! যখন তখন মুখখানিকে অমন কালো ক'রে?"

ইহা যেন অনির জীবনে একটা অনাস্বাদিত প্রীতি। বন্ধুত্বের এত নিবিড় বেষ্টন সে কোনদিনই পায় নাই। শৈশবের স্মৃতিতে যে দুই একটী ক্ষীণ রেখা জাগিয়া ছিল, তাহা এই ব্যথিত জীবনে কোন শান্তিই দিতে পারে নাই। সুলতাও তাহাকে এমনি ভালবাসে, কিন্তু সেই নিতান্ত সরলা তাহারই উপর এতখানি নির্ভর করিয়া চলে যে, অনি নিজে কোন দিনই নিজের দুশ্চিন্তার ভার তাহার উপর দিয়া নির্ভর করিতে পারে না। মঞ্জিষ্ঠার স্নেহ-স্পর্শে অনির চোখে জল আসিতেছিল।

অনিকে নীরব দেখিয়া মঞ্জিষ্ঠা তাহার পাশে বসিয়া সস্নেহে চিবুকটি নাড়িয়া দিয়া বলিলেন—"লুকোস্ নি। তোর মুখ দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে তুই একটা ব্যথার বোঝা নিয়ে শুধুই সেটাকে লুকোবার জন্যে মনের কোণ খুঁজে বেড়াচ্ছিস্। তার ভারে মুখ-চোখ তোর এমনি হয়ে গেছে যে, দেখ্‌লে কান্না পায়। মানুষ নিজে যা বইতে পারে না, বন্ধু-বান্ধবকে তার অংশ দিয়ে অনেকটা হাল্কা হ'তে পারে। আর বন্ধুরাও তার অংশ নিয়ে তাকে হাল্কা ক'র্‌তে পারে ব'লেই তারা বন্ধু। মনের দরজা যত বন্ধ ক'রে রাখ্‌বি, অন্তরের ঠাকুর শ্বাস-রুদ্ধ হ'য়ে ততই

ছট্‌ফট্‌ ক'রবে ; অন্ধকার বাড়্'বে ছাড়া কম্'বে না। তোর যে কিসের অত দুশ্চিন্তা, তা তোকে বল্'তেই হবে আজ। সবাই বলে যে তুই সর্ব্বদা এই ঘরের কোণে চুপ ক'রে বসে' থাকিস্। তবে যে তুই কেন এই মেসে এসে পড়ে' রয়েছিস্ তা' বুঝ্‌লুম না। যে-কোনো একটা কাজ হাতে নে ; কাজের চাপে সব দুর্ভাবনাই মিলিয়ে যাবে। নিজের জীবনের খুঁটিনাটি নিয়েই যদি মানুষ অত ভাবে, তা' হ'লে এত বড় দুনিয়ার কথা ভাব'বার অবসরই যে তারা পাবে না ভাই। নয় কি ? তুই বল্!"

অনি ঠিক এমনি একটা কিছু চাহিতেছিল। নিজের দুর্ব্বলতায় সে হাত বাড়াইয়া কোন আশ্রয় ধরিতে পারিতেছিল না বলিয়াই তাহার অন্তর এমনি একখানি প্রসারিত বাহুর জন্য কাঁদিয়া মরিতেছিল। অনির ইচ্ছা হইতেছিল—সে মঞ্জিষ্ঠার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে : 'ওগো দিদি, আমার বুকের দুয়ার জোর ক'রে ভেঙে, তুমি তার সব বোঝা নিয়ে আমায় হাল্কা কর। আমি যে আর পারি না।' পরক্ষণেই তাহার মনে হইল—মেজরের কথা, মেজরের সেই পাপ-আশ্রয়! তাহা তো সে প্রাণ থাকিতে কাহারো কাছে ব্যক্ত করিতে পারিবে না। জীবনে সব-হারানোর ব্যথা তাহার সহ্য হইয়াছে, এ ব্যথাও তাহাকে নীরবে সহ্য করিতে হইবে। সে নিঃস্ব, সে ভিক্ষুক! বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সে তাহার অভাবের ঝুলি সাহায্যে ভরিবে,—কিন্তু তাহার দৈন্যের ঝুলিতে বিশ্ব-জনের ঘৃণার মুষ্টি-ভিক্ষা চাহিয়া লইয়া সে আর বহিতে পারিবে না।

নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া মঞ্জিষ্ঠার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া অনি বলিল—"মঞ্জিষ্ঠাদি, আমি একটা কাজের খোঁজেই

আজ এক মাস ধরে' মেসে বসে' আছি। কিন্তু যোগাড় ক'রে উঠ্‌তে পারি নি—আজও কিছুই। কোল্‌কাতার কোনো জায়গাই ভালভাবে চিনি না, জানি না, তাই বাধ্য হ'য়ে সারা দিন ঘরের কোণেই বসে' আছি, আর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দু'-একটা দরখাস্ত কর্‌ছি মাত্র। তাতে বিশেষ কিছু হবে বলে' আর আশা হয় না। কাজ-কর্ম্ম একটা পেলে নিজের ব্যথা অনেকটা ভুলে' থাক্‌তে পার্‌তুম,—তাতে সন্দেহ নেই। কর্ম্মহীন দিনগুলো কাটতে চায় না; দুশ্চিন্তার কাঁড়ি এসে মনের ভিতর জমে। তবুও আপনার চরকাটা পেয়ে যেন আজ কয়েক দিন একটু অবলম্বন পেয়েছি: অন্ততঃ কিছুক্ষণ সময় বেশ নিশ্চিন্তে কেটে যায়। নইলে, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা সারা দিনই মনটাকে এতো অসাড় ক'রে রাখে যে, এক এক সময় প্রায় পাগল হ'য়ে উঠি। আচ্ছা দিদি, আমাকে আপনাদের সমিতির মধ্যে নিতে পারেন না?"

"নিশ্চয়ই পারি—খুব পারি, একশো বার।" মঞ্জিষ্ঠা সাগ্রহে তাঁহার দীর্ঘ বাহু দুইটীতে অনিকে বেষ্টন করিয়া অপরিসীম আনন্দের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"তা' হ'লে কা'লই তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে 'স্বেচ্ছা-সেবিকা' খাতায় নাম লিখিয়ে দেবো, কি বল?"

"তাই ভালো মঞ্জিষ্ঠাদি, আমায় আপনাদের কাজের মধ্যে টেনে নিন্। আমি জানি, আপনাদের মত দেশের ও দশের সেবায় অমন ক'রে নিজেকে উৎসর্গ ক'র্‌বার ক্ষমতা বা যোগ্যতা আমার নেই। যে জীবন পঙ্গু হ'য়ে গেছে, তার পক্ষে ও-রকম মহাব্রত নেবার আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় গিরি-লঙ্ঘনের বাসনার মত

বাতুলতা হবে মাত্র। কিন্তু যা-হোক-কিছু একটা নিয়ে তো আমায় বাঁচ্‌তে হবে। দশ'কে টেনে রাখবার ক্ষমতা যার নেই, দশের ও দেশের কাজে নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দেওয়া ভিন্ন তার আর বাঁচ্‌বার পথও নেই।"

ক্ষণেক কি চিন্তা করিয়া অনি পুনরায় বলিল—"কিন্তু দিদি, কেবল স্বেচ্ছা-সেবিকার ব্রত নিলেই তো আমার চ'ল্‌বে না; ঐ সঙ্গে আমায় আরো কিছু ক'র্‌তে হবে—নিজের উদরান্নের সংস্থানের জন্যে। নইলে আমার চল্‌'বার কোন উপায়ই নেই। সংসারে আমার এমন কেউ নেই যে—"

অনির কথা শেষ না হইতেই মঞ্জিষ্ঠা দেবী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন—"থাম্, তোর আর সংসারের কথা তুলে কাজ নেই। কেবল কেউ নেই, আর কিছু নেই—এই কথাগুলো আমি একবারেই শুন্‌'তে পারি নে। যার কেউ নেই, তার সবাই আছে। 'কেউ' থাক্‌'লে, হয় তো সেই পাঁচ-সাতজন 'কেউ' মিলে জীবনটাকে একবারে নিজস্ব ক'রে খাস-দখলে রাখ্‌তো; যার 'কেউ' নেই, সে দেশ দুনিয়ার লোককে আপনার ক'রে নিয়ে নিজের প্রাণটাকে অবাধ ভাবে ছড়িয়ে দিতে পারে। জীবনের পথে অমন সব 'কেউ' না থাকাই ভালো। তুই নিজের খরচ চালাবার মত একটা কাজ-কর্ম্ম পেতে চা'স্? বেশ, সে কথা তো আমায় আগে ব'ল্‌লেই পারতিস্। চেষ্টা ক'রলে একটা-না-একটা কিছু জোগাড় হোত'ই—কোন্ দিন্।"

"চেষ্টা তো আজ এক মাস ধরে' কর্‌ছি দিদি, কিন্তু হ'য়ে উঠ্‌ছে কৈ!" অনি মঞ্জিষ্ঠার মুখের দিকে চাহিল।

মঞ্জিষ্ঠা তখন অনেকখানি প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া-

আজ এক মাস ধরে' মেসে বসে' আছি। কিন্তু যোগাড় ক'রে উঠ্‌তে পারি নি—আজও কিছুই। কোল্‌কাতার কোনো জায়গাই ভালভাবে চিনি না, জানি না, তাই বাধ্য হ'য়ে সারা দিন ঘরের কোণেই বসে' আছি, আর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দু'-একটা দরখাস্ত কর্‌'ছি মাত্র। তাতে বিশেষ কিছু হবে বলে' আর আশা হয় না। কাজ-কর্ম্ম একটা পেলে নিজের ব্যথা অনেকটা ভুলে' থাক্‌তে পার্‌তুম,—তাতে সন্দেহ নেই। কর্ম্মহীন দিনগুলো কাটতে চায় না; দুশ্চিন্তার কাঁড়ি এসে মনের ভিতর জমে। তবুও আপনার চবকাটা পেয়ে যেন আজ কয়েক দিন একটু অবলম্বন পেয়েছি: অন্ততঃ কিছুক্ষণ সময় বেশ নিশ্চিন্তে কেটে যায়। নইলে, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা সারা দিনই মনটাকে এতো অসাড় ক'রে রাখে যে, এক এক সময় প্রায় পাগল হ'য়ে উঠি। আচ্ছা দিদি, আমাকে আপনাদের সমিতির মধ্যে নিতে পারেন না?"

"নিশ্চয়ই পারি—খুব পারি, একশো বার।" মঞ্জিষ্ঠা সাগ্রহে তাঁহার দীর্ঘ বাহু দুইটীতে অনিকে বেষ্টন করিয়া অপরিসীম আনন্দের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"তা' হ'লে কা'লই তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে 'স্বেচ্ছা-সেবিকা' খাতায় নাম লিখিয়ে দেবো, কি বল?"

"তাই ভালো মঞ্জিষ্ঠাদি, আমায় আপনাদের কাজের মধ্যে টেনে নিন্। আমি জানি, আপনাদের মত দেশের ও দশের সেবায় অমন ক'রে নিজেকে উৎসর্গ ক'র্‌বার ক্ষমতা বা যোগ্যতা আমার নেই। যে জীবন পঙ্গু হ'য়ে গেছে, তার পক্ষে ও-রকম মহাব্রত নেবার আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় গিরি-লঙ্ঘনের বাসনার মত

বাতুলতা হবে মাত্র। কিন্তু যা-হোক-কিছু একটা নিয়ে তো আমায় বাঁচ্‌তে হবে। দশ'কে টেনে রাখবার ক্ষমতা যার নেই, দশের ও দেশের কাজে নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দেওয়া ভিন্ন তার আর বাঁচ্‌বার পথও নেই।"

ক্ষণেক কি চিন্তা করিয়া অনি পুনরায় বলিল—"কিন্তু দিদি, কেবল স্বেচ্ছা-সেবিকার ব্রত নিলেই তো আমার চ'ল্‌বে না; ঐ সঙ্গে আমায় আরো কিছু ক'র্‌তে হবে—নিজের উদরান্নের সংস্থানের জন্যে। নইলে আমার চল্‌'বার কোন উপায়ই নেই। সংসারে আমার এমন কেউ নেই যে—"

অনির কথা শেষ না হইতেই মঞ্জিষ্ঠা দেবী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন—"থাম্, তোর আর সংসারের কথা তুলে কাজ নেই। কেবল কেউ নেই, আর কিছু নেই—এই কথাগুলো আমি একবারেই শুন্‌'তে পারি নে। যার কেউ নেই, তার সবাই আছে। 'কেউ' থাক্‌'লে, হয় তো সেই পাঁচ-সাতজন 'কেউ' মিলে জীবনটাকে একবারে নিজস্ব ক'রে খাস-দখলে রাখ্‌তো; যার 'কেউ' নেই, সে দেশ দুনিয়ার লোককে আপনার ক'রে নিয়ে নিজের প্রাণটাকে অবাধ ভাবে ছড়িয়ে দিতে পারে। জীবনের পথে অমন সব 'কেউ' না থাকাই ভালো। তুই নিজের খরচ চালাবার মত একটা কাজ-কর্ম্ম পেতে চা'স্? বেশ, সে কথা তো আমায় আগে ব'ল্‌লেই পারতিস্। চেষ্টা ক'রলে একটা-না একটা কিছু জোগাড় হোত'ই—কোন্ দিন্।"

"চেষ্টা তো আজ এক মাস ধরে' করছি দিদি, কিন্তু হ'য়ে উঠ্‌ছে কৈ!" অনি মঞ্জিষ্ঠার মুখের দিকে চাহিল।

মঞ্জিষ্ঠা তখন অনেকখানি প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া-

ছেন। অনির কথায় ঈষৎ হাসিয়া তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বেগে এক নিঃশ্বাসে বলিলেন—"যা! যা! খুব হ'য়েছে। খবরের কাগজ আর বিজ্ঞাপন দেখেই যদি কাজ হ'তো, তা হ'লে লোকে দুশো পাঁচশো টাকা খরচ ক'রে দেশ-বিদেশে না গিয়ে, বাড়ী বসে' দু' পয়সার 'দৈনিক' কিনেই সব যোগাড় ক'রে ফেল্‌তো। থাক্, আমি কা'লই যাচ্ছি তোর কাজের চেষ্টায়—সুরথদা'র বাড়ী। সেদিন তিনি ব'লেছিলেন বটে একজন ভাল শিক্ষয়িত্রীর কথা—'কণা'র জন্যে। আমার খুব নিকট আত্মীয় তাঁরা; লোকও অতি ভদ্র; তোর সঙ্গে ঠিক মিলবে।"

অনিকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া মঞ্জিষ্ঠা দেবী ঠিক যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন—একটা ঝড়ের ঝাপ্টার মত।

১৮

মোক্ষদাসুন্দরীর পিতা মনোহর ও রাধাকিশোরের পিতা চন্দ্রশেখর ছিলেন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। কিন্তু মনোহর ও চন্দ্রশেখর যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন উভয় ভ্রাতার মধ্যে প্রীতি ও স্নেহের বন্ধন কোন সময়ের জন্যও শিথিল হয় নাই। উভয়েই চন্দ্রশেখর-জননী বিমলা দেবীর ক্রোড়ে সমান স্নেহে ও যত্নে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। পিতা ও পিতৃব্যের মৃত্যুর 'পর রাধাকিশোর সেই পূর্ব্ব-প্রীতির প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠতাতের একমাত্র কন্যা মোক্ষদাসুন্দরীকে সহোদরার সকল আসন পরিপূর্ণ রূপে ছাড়িয়া দিয়া। মোক্ষদাকে সুখী

করিবার জন্য তিনি আমরণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সহপাঠী গোপীমোহনের প্রতি তাঁহার যে বন্ধুত্বের আকর্ষণ ছিল, ভগিনীপতি গোপীমোহনের প্রতি তাহা একাধারে স্নেহ-ভালবাসা ও প্রীতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রাধাকিশোরের উদার প্রকৃতি ও সহৃদয় ব্যবহার গোপী-মোহনকে একান্ত মুগ্ধ করিয়াছিল, তাই বয়সে তাঁহার অপেক্ষা অনেক ছোট হইলেও, তিনি রাধাকিশোরকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা না করিয়া পারিতেন না। গোপীমোহন জানিতেন—রাধাকিশোর তাঁহাদের জন্য কতখানি চেষ্টা-যত্ন করিয়া তাঁহাদিগকে সুখী ও সমৃদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই রাধাকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারবর্গের শোচনীয় অবস্থার কথা সেদিন যখন অনির নিকট তিনি বিস্তৃতভাবে শুনিলেন—তখন গোপীমোহনের হৃদয় বেদনায় ভাঙিয়া পড়িল। রাধাকিশোরের একমাত্র স্নেহের-দুলালী অনিকে তাঁহার পক্ষপুটের মধ্যে টানিয়া লইবার জন্য গোপীমোহনের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু মোক্ষদাসুন্দরীর সেই কল্পনাতীত ঔদাসীন্য ও কর্কশ ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার সে আগ্রহ নিমেষে উপিয়া গেল। মোক্ষদা অনির পিসিমা, রাধা-কিশোরের ভগিনী। সেই মোক্ষদাই যখন তাহার ভগিনীগত প্রাণ অগ্রজের একমাত্র কন্যাকে ভালরূপে চিনিতে পর্য্যন্ত পারিল না, তখন গোপীমোহনের মস্তিষ্ক যেন সহসা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। তিনি যে কি করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। প্রখরা মোক্ষদাকে একটু ভয় করিয়া চলিলেও, তাহাকে উপেক্ষা করিবার মত সাহসও হয় তো তাঁহার ছিল; কিন্তু সেই উপেক্ষার পরিণামের ভিতর পড়িয়া মন্দভাগিনী অনির

জীবন মোক্ষদার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিবে, সেই কথা ভাবিয়াই গোপীমোহন নীরবে সকল বেদনা সহ্য করিতে বাধ্য হইলেন। অনাথা হইলেও অনির শ্বশুরালয়ে যাহা কিছু সংস্থান আছে, তাহাতে তাহার বাকী দিনগুলি ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী শান্তির সঙ্গেই কাটিবে। গোপীমোহন মোক্ষদার মনোভাব লক্ষ্য করিয়া অনিকে রাখিবার চেষ্টা করিলেন না।

অনি চলিয়া যাইবার পর তাঁহার মনে হইল—বোধ হয় তাহার উত্তপ্ত জীবনে একটু শান্তি পাইবার আশায় অনি ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাঁহাদের স্নেহ-আশ্রয়ের সন্ধানে। স্বভাব-অভিমানিনী অনির চিত্তে তাহার পিসিমার ব্যবহার শেলের মত বিঁধিয়াছে, সেই জন্যই হয় তো অনি কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। আহা! বালিকা সে—সেই তো সেদিনের! কিন্তু অভাগীর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখের সব অধ্যায়-গুলিই যেন আচম্বিতে একটা নিকষ-কালো যবনিকায় ঢাকিয়া গিয়াছে। স্বামীকে সে জীবনে একটী দিনের জন্যও স্বামীরূপে দেখিবার সুযোগ পায় নাই। সেই বিবাহের রাত্রে একটা জনতার মধ্যে শুধু একটি মুহূর্ত্তের সুযোগ ভগবান তাহাকে দিয়াছিলেন—তাহার নারী-জীবনের একমাত্র সম্বল, ইহ-পরকালের আশ্রয় স্বামীকে দেখিবার জন্য। রাধাকিশোর ও বৌদি'র সেদিন সে কী আনন্দ! অনিকে লইয়া আনন্দ ভোগ করিবার পূর্ণাহুতিই সেদিন হইল বলিয়া বোধ হয় রাধাকিশোরের স্থির চিত্তও আনন্দে অত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। আনন্দে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন—"গোপী, মাকে আমার যেন আজ সাক্ষাৎ গৌরীর মত দেখাচ্ছে। এই সাধ আমার অনেকদিন হ'তে ছিল।"

রাধাকিশোরের চোখ দিয়া তখন ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া আনন্দের অশ্রু-ধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই এয়োতি-গৌরীর সাজ,—আহা, দেখিতে দেখিতে কয়েক মাসের মধ্যেই অনুর অঙ্গ হইতে খুলিয়া পড়িয়া গেল,—কোন্‌ নিষ্ঠুর ভাগ্য-দেবতার অভিশাপে, কে জানে! দ্বিরাগমনের-সুযোগটুকু পর্য্যন্ত জীবনে ঘটিয়া উঠিল না। য়ুরোপের সেই কাল মহাসমর যেন ভারতের ভাগ্যেই একটা অমঙ্গলের ধূমকেতু হইয়া উঠিয়াছিল।

অনির কথা ভাবিতে ভাবিতে গোপীমোহনের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতেছিল। পরক্ষণে যখনই তাঁহার মনে হইল—অনির শ্বশুরালয়ে যথেষ্ট সংস্থান থাকিলেও তাহার ন্যায় নিতান্ত অল্প-বয়স্কা বিধবার পক্ষে সেই শ্বশ্রূ-স্বামিহীন গৃহে প্রতিষ্ঠা পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিবে; গোপীমোহনের মনটা সহসা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। অনিকে কেন তিনি আট্‌কাইয়া রাখিলেন না? মোক্ষদার উপর তাঁহার অত্যন্ত রাগ হইল; নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যও তিনি নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। অন্ততঃ অনির ঠিকানাটুকু তিনি জানিয়া রাখিলেন না কেন? অনিকে তিনি যেমন করিয়া হউক ফিরাইয়া আনিতেন। তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিয়াও অনি তাহাতে আপত্তি করিতে পারিত না।

*　　*　　*　　*

সেদিন রবিবার। মধ্যাহ্নে আহারাদি শেষ করিয়া গোপী-মোহন তাঁহার শয়ন-কক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন। ঈষৎ তন্দ্রায় চক্ষু দুইটি মুদ্রিত হইয়া আসিলেও গড়গড়ার নলটী তখনো সে বিশ্রামের সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই।

মোক্ষদাসুন্দরী গজেন্দ্র ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ক্ষেত্র বিশেষে, গোপীমোহনের নিকট কোন অভিযোগ, অনুযোগ বা উদ্দেশ্য লইয়া আসিতে হইলেই মোক্ষদার স্বাভাবিক স্থুলগতি এমন একটা রূপান্তর গ্রহণ করিত, যাহাতে — অন্ততঃ মোক্ষদা নিজে, তাহার সেই গতিকে স্বয়ং মোক্ষদাত্রীর গতি অপেক্ষাও অধিকতর মহিমময় করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিত না ; এবং মোক্ষদার এই ভাবান্তরের অর্থ-টুকু বুঝিয়া লইতে গোপীমোহনেরও ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইত না। কিন্তু মোক্ষদার চোখে নিজের সেই অস্বাভাবিকতা ধরা পড়িবার কোনো আশাই ছিল না ; কেননা, সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব জগতের অনুভূতি তাহার মধ্যে জন্মাবধিই মূক ও বধির হইয়া ছিল।

স্বামীকে নিদ্রিত দেখিয়া মোক্ষদা একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কপাল ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিল। গোপীমোহন যে তাহার জন্য একটুও অপেক্ষা না করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, ছুটির দিনে দুই একটি কথা বলিবার ফুরসৎ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দিলেন না—ইহাতে মোক্ষদার ওষ্ঠে কিঞ্চিৎ অভিমান ও বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সোজাসুজিভাবে গোপীমোহনের নিদ্রাভঙ্গের কোন চেষ্টা না করিয়া সে খাটের পাশেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া গভীর একাগ্রতার সহিত সুপারি কাটিতে আরম্ভ করিল।

উৎকলী যাঁতির অবিশ্রান্ত খট্ খট্ শব্দ ও দোক্তা-ক্রান্তা মোক্ষদার সজোর হিক্কাধ্বনিতে বেচারা গোপীমোহনের তন্দ্রা ছুটিয়া যাইতে বিলম্ব হইল না। 'মোক্ষদা আসীনা' দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি সপ্রতিভ ভাবে গড়গড়ায় গোটা দুই টান দিয়া একটু

গলা ঝাড়িয়া বলিলেন—"কি গো! আজ যে খাওয়া-দাওয়া খুব সকাল সকাল সেরে নিয়েছ! ব্যাপার কি?"

মোক্ষদা সেইরূপ কার্য্যরত ভাবেই উত্তর দিল—"আহা! ঘুমোও না বাবু! আমি কি তোমায় ডেকেছি ঘুম ভাঙাবার জন্যে?"

গোপীমোহন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিলেন: "না—ঘুমোই নি তো। এই তোমার খেতে নিতে একটু দেরী আছে ভেবে কেবল কি না একটু—" মোক্ষদার বিরক্তির কথা ভাবিতেই স্বামীর কৈফিয়ৎ, নিদ্রা, তন্দ্রা ও তামাকু সেবন—সব এক সঙ্গে তাল পাকাইয়া গেল। মোক্ষদার বিরুদ্ধে, নানারূপ দৃঢ়তা চিত্তে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেও, সম্মুখে আসিলেই তাঁহার সমস্ত চিন্তা যেন পাক খাইয়া যাইত। মোক্ষদাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এক গাল হাসিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন—"তুমি যে ব'ল্‌ছিলে কি কথা আছে তোমার—খাওয়া-দাওয়ার পর।"

মোক্ষদা মনে মনে একটু হাসিল: মাছ যতই সরিবার নড়িবার চেষ্টা করুক, তাহার জালের ঘাই ছিঁড়িয়া পলাইবার শক্তি নাই।

"থাক্ না সে কথা এখন; তুমি একটু ঘুমোও। আমার কথা আর এমন কি বিশেষ জরুরী!"

মোক্ষদা একবার, তাহার জীবনের কোন সুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া আসা, বিগত যৌবনের মাধুর্য্যটুকুকে স্মরণ করিয়া যথাশক্তি চোখ-মুখে তাহা টানিয়া আনিয়া স্বামীর পানে চাহিল।

"তবুও।"

"বল্'ছিলুম—এবার পূজোয় কোথায় যাচ্ছ? ভব-ঘুরের মত চিরদিনই কি বিদেশে ঘুরে বেড়াবে? দেশের বাড়ী-ঘরগুলো তো

বজায় রাখাও দরকার! পুরোনো ঘর-টরগুলো ভেঙে ফেলে আমাদের থাকবার মত একটা নতুন বাড়ী উঠিয়ে নিলে, তোমার ছুটি-ছাটার সময় দেশে গিয়ে থাকা হয়। তাতে বাপের ভিটেটাও বজায় থাকে, সম্পত্তি অল্প-স্বল্প যা আছে, তাও দেখা-শুনা হয়। চিরদিন কি বিদেশেই কা'টুবে?"

মোক্ষদা বেশ গম্ভীর ভাবে স্বামীর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

হঠাৎ মোক্ষদার এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে না পারিয়া গোপীমোহন একটু আশ্চর্য্য হইয়াই বলিলেন—"আমার আবার দেশ কোথায় মোক্ষি! বাপের ভিটে তো পড়াশুনো ক'র্‌বার সময়ই বিক্রী হ'য়ে গেছে। নূতন ক'রে আবার সে-সব কর্‌বার হাঙ্গামা ক'রে লাভ কি বল? আর ক'র্‌লেই বা সে-সব কার জন্যে! ছেলে-পুলেও নেই; দু'টি প্রাণী; আমার এই অল্প আয়ের যা অবশিষ্ট থাক্‌বে, তাতেই কোনরকমে বাকী জীবনটা এইখানেই কেটে যাবে।"

"তোমার বাবার ভিটে না থাক্‌লেও, আমার বাপের ভিটে তো এখনো যায় নি। আর ভোগ-দখল ক'র্‌বার লোকই বা নেই কেন? বালাই! তোমরা আপন-জনকে খোঁজ না, তাই বলো। নইলে এই তো মণ্টু—আমার মামাতো ভাই, চিঠির পরে চিঠি লিখ্‌ছে। একটু আদর-যত্ন পেলেই সে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ছুটে আস্‌বে।"

গোপীমোহন যেন অবাক্ হইলেন। মোক্ষদার পৈত্রিক বাস-ভূমি ও সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহায় সবই তো তাঁহার পর-লোকগত শ্বশুরমহাশয় রাধাকিশোরের নামে লিখিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি সেইরূপ বিস্মিতভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বাবা সে সবই তোমার দাদাকে দিয়ে গিয়েছিলেন না—মোক্ষদা ?"

"তুমিও যেমন দেখেছ ! বাবা লিখে দিয়েছিলেন না হয় ; কিন্তু দাদার বংশে যখন বাতি দিতেও রইলো না কেউ, তখন ওসব তো এখন আমাদেরই ন্যায্য পাওনা। এই সব ভাব-গতিক বুঝেই তো সেদিন ঐ ঝানু মেয়েটি এসেছিলো, মিষ্টি কথায় এ-সব হাত ক'র্‌বার মত্‌লবে। কিন্তু আমার কাছে উড়ে যাওয়া বড় সোজা নয় যাদু। তুমি যাবে ডালে ডালে, আমি যাবো পাতায় পাতায়।"

"সে কি কথা মোক্ষি! অনুকে তুমি ভুল বুঝেছ; রাধা-কিশোরের মেয়ে সে। মা-বাপের জীবনের সকল গুণ ও তেজস্বিতা তার ভিতর আছে। সম্পত্তির মায়া কোনো দিনই তার অন্তরকে নীচ ক'রতে পারে না। সম্পত্তির অভাব তো তার নেই। তোড়ন-গাঁয়ে তার স্বামীর যে সম্পত্তির সে মালিক, তার কাছে চাঁদপুরের সামান্য জমি-জমা কত তুচ্ছ তা' তুমি জানো না। রাধু-দা যেদিন জামাইএর মৃত্যুর খবর পেয়ে আমার কাছে বৌদিকে দিয়ে সেই কয়েকটা লাইনের চিঠিখানা লিখিয়েছিলেন,—সেইদিনই বুঝেছিলুম সম্পত্তি তাদের কাছে কত সামান্য জিনিষ। মেয়ের সব সুখই যদি অকালে শেষ হ'য়ে গেল, তা'হ'লে আর সম্পত্তি নিয়ে কি হ'বে বল ?"

"ওগো, সে আমি সব বুঝি। সম্পত্তির মায়া ছেড়ে দেওয়া অত সহজ নয়। তোমার ওকালতি বুদ্ধির কাছে টিঁকে উঠ্‌তে পা'রবে না বলে'ই কায়দা ক'রে কাজ সিদ্ধির জন্যে এসেছিল সে। মানুষকে আমি ঠিক্ চিন্‌তে পারি; তা জেনে রেখো।"

"ভুল বুঝেছ, মোক্ষদা। তাকে তুমি চিন্‌তে পারনি। সে বোধ

হয় নিতান্ত অসহায় হ'য়েই আমাদের কাছে এসেছিল। সম্পত্তির অভাব তার নেই; তোড়ন-গাঁয়ের অত বড় সম্পত্তির মালিক সে। আমার মনে হয়, অনাথা বিধবা সে—তোড়ন-গাঁয়ের সে সম্পত্তিতে হয় তো সে দখল নিতে পারে নি; শরীকরা সব বেদখল ক'রে ফেলেছে। অনি চলে' যেতেই আমার সে কথা মনে হ'ল। নইলে, কাশীতে গিয়ে তারা ছিল কেন? নিতান্ত সহায়হীনা বিধবার পক্ষে হয় তো সে নির্জ্জন পুরীতে প্রবেশ করবার অধিকার পাওয়া খুবই অসম্ভব হ'য়ে পড়েছে। তার জন্যেই আমার সাহায্য পেতে এসেছিল বোধ হয়—তার শ্বশুর তো সবই—"

গোপীমোহনের কথা শেষ না হইতেই মোক্ষদা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"ভালো দেখেছ তুমি! অমন যার বয়েস আর রূপের চটক্ তার আবার সহায় সম্বলের অভাব।"

"মোক্ষদা!" গোপীমোহনের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। তাঁহার মাথার মধ্যে ঝিম্-ঝিম্ করিয়া উঠিল। মোক্ষদার উপর ঘৃণায় তাঁহার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। এই মোক্ষদা রাধাকিশোরের ভগিনী! যে রাধাকিশোর মোক্ষদাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন! সামান্য স্বার্থের চিন্তাও যে মানুষের অন্তরকে এতো নীচ করিয়া দিতে পারে, তাহা গোপীমোহন কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

মোক্ষদা তখন দাঁতে দাঁত চাপিয়া একটা সুপারিকে দ্বিখণ্ডিত করিবার জন্য সজোরে যাঁতির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।

গোপীমোহন কোন কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মোক্ষদার পানে ফিরিয়া চাহিতেও যেন তাঁহার ঘৃণা হইতেছিল।

মঞ্জিষ্ঠার চেষ্টায়, আহার বাসস্থান ও মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে, অনি শ্যামবাজারে সুরথবাবুর বাড়ীর গৃহশিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা হইল।

কণা সবেমাত্র সাত বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে; ঠিক সৌন্দর্য্য-চন্দ্রমার শুক্লা সপ্তমীর চাঁদখানির মত। জীবন-উষার সবটুকু স্নিগ্ধতা যেন প্রকৃতি আপন-হাতে কণার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিয়াছেন। ভোরবেলাকার টগরের মত তার ফুট্‌ফুটে রঙ, আর তাহারই বুকের নির্ম্মল শিশিরের মত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল চোখ দু'টী; সারা মুখ-খানি যেন প্রভাত-সূর্য্যের সোণালী কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া আছে।

মঞ্জিষ্ঠার ডাক শুনিয়াই কণা যখন ছুটিয়া আসিল, তাহার ঘাড় পর্য্যন্ত লম্বা মখ্‌মলের মত থোকা-থোকা চুলের গোছাগুলি দোলাইতে দোলাইতে,—অনির অন্তরের অবরুদ্ধ 'মা' যেন সহসা তাঁহার লৌহ নিগড় ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল। এই কণা! এই কণাকে ছাত্রীরূপে পাইবে সে তাহার কোলের পাশে! এ যে ভগবানের অসীম দয়ার দান। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল, নিজের অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাসের কথা স্মরণ করিয়া; এই কণাকে কোলে পাইবার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই যে তাহার হীন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে— শুধু তাহার অর্থের লালসায়। কণাকে বুকে করিয়া লইবার বিনিময়ে তাহাকে বেতন গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা নিষ্ঠুর পরিহাস তাহার অদৃষ্টে আর কি থাকিতে পারে!

"পিসিমা" বলিয়া মঞ্জিষ্ঠার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই, কণাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, মঞ্জিষ্ঠা তাহার চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে বলিল—"কণি-মা, এই দেখ্, তোমার গুরু-মা এসেছেন!"

মঞ্জিষ্ঠার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কণা একবার অনির পানে চাহিল। তাহার পর মঞ্জিষ্ঠার কাণের কাছে মুখখানি সংলগ্ন করিয়া বলিল—"গুরু-মা ?"

"হাঁ, গুরু-মাকে নমো কর মাণিক !"

মঞ্জিষ্ঠা তাহাকে অনির দিকে একটু ঠেলিয়া দিতেই, কণা তাঁহার কোল হইতে নামিয়া অনির পায়ের কাছে মাটির উপর মাথাটি ঠেকাইল।

অনি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল—অন্তরের সমস্ত স্নেহ ও আগ্রহ দিয়া। এ যে তাহার জীবনে ভগবানের দেওয়া পূত নির্ম্মাল্য ; তাহার মরুভূমিতে শান্তিধারা !

কণা অনির ঠোঁটের উপর নিজের কচি হাতখানি দিয়া তাহাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি গুরু-মা ?"

অনি তাহাকে বুকের উপর আরো একটু নিবিড়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"হাঁ, মাণিক !"

কণার রকম দেখিয়া তখন তাহার মামীমা নীলিমা দেবী মঞ্জিষ্ঠার মুখপানে চাহিয়া হাসিতেছিলেন।

অনির মনে কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজিতেছিল—

ওরে ও হাস্য-সরল নৃত্য-চপল কুরঙ্গ,
এ যে মোর উন্মনা মন বিহঙ্গ ॥

কণা মঞ্জিষ্ঠার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও সুরথবাবুর ভাগিনেয়ী। সুরথ-বাবু নীলিমার সমস্ত স্নেহ-যত্নের একমাত্র ধন হইয়া কণা পলে পলে বাড়িতে থাকিলেও, অনি মঞ্জিষ্ঠার নিকট কণার এই এক-কণা জীবনের যে ছোট্ট ইতিহাসটুকু শুনিয়াছিল, তাহাতে তাহার মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-উৎস যেন সহস্রধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া

উঠিয়াছিল—কণাকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য। এই কচি শিশু কণা জন্মের সাথে-সাথেই পূর্ব্বজন্মের কোন নিষ্ঠুর অভিশাপ মাথায় করিয়া আনিয়াছিল, কে জানে! কণা যখন সবেমাত্র দুই বৎসরের, এই আধো আধো ভাষা যখন তাহার কণ্ঠের মধ্যে জড়াইয়া ছিল, সেই জীবনের অবিকসিত উষায় কণা বঞ্চিত হইয়াছে—জীবজগতের অতুলনীয় সম্পদ মাতা-পিতার স্নেহ-সিংহাসন হইতে। উর্ম্মিলা মরিয়া শান্তি পাইয়াছে; কিন্তু তাহার বুকের রক্ত দিয়া গড়া স্মৃতির একটী কণা—এই কণার জীবনের শুভ্র ও স্বচ্ছ ছবিখানির উপর ভগবান যে নির্ম্মম-তুলির দাগ টানিয়া দিলেন তাহা সে মুছিয়া লইয়া যাইতে পারে নাই।

মঞ্জিষ্ঠার নিকট কণা ও উর্ম্মিলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পূর্ব্বে শুনিয়া থাকিলেও, আজ কণাকে দেখিয়া অনির মনের মধ্যে অনেক প্রশ্নই ঠেলিয়া উঠিতেছিল। এই ফুলের মত সুন্দর মেয়েটীর জীবনেও যে ভগবান এত বড় বিপ্লব বাধাইয়া তুলিলেন কেন, তাহা অনি ভাবিয়া পাইতেছিল না।

পথে বাহির হইয়া অনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া পুনরায় সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া মঞ্জিষ্ঠা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা দিদি, কণার বাপ যে কোনো বিষয় না ভেবে-চিন্তে এতবড় একটা কাণ্ড ক'রে ব'স্‌লেন, উর্ম্মিলা কি তাতে নিজের মানরক্ষার জন্যে কোনো কথাই বলেন নি? আমার মনে হয়, যদি তাঁর স্বামীকে তিনি সে বিষয়ের সত্য-মিথ্যে সব স্পষ্ট ক'রে দেখিয়ে দিতেন, তা হ'লে হয় তো পরিণামটা অতদূরে গিয়ে দাঁড়াতো না।"

ক্ষণেক কি ভাবিয়া, মঞ্জিষ্ঠা দেবী গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"উর্ম্মিলা কি বলেছিল, তা জানি না। তবে সতীত্বের

যে তেজ তার ছিল, তা সে স্বামীর কাছে নিশ্চয়ই খাটো করে নি। তাকে আর কেউ না চিনুক, আমি তো খুব ভালো ভাবেই চিন্‌তুম অনি। স্বামীর প্রতি তার যে ভক্তি ও ভালবাসা ছিল, তার মর্য্যাদা বোধ হয় দাদা কোনো দিনই বুঝতে পারেন নি। নইলে—; কি জানি! ঐ দাদাই আবার একদিন উর্ম্মিলার ভালবাসায় আত্মহারা হ'য়ে, তাকে বিয়ে ক'র্‌বার জন্যে পাগল হ'য়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজেই উর্ম্মিলার বাবা সমাধীশবাবুর কাছে ঐ বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। তাতে সমাধীশবাবুই বরং উপদেশ দিয়ে দাদাকে কত ক'রে বুঝিয়েছিলেন—আগে লেখাপড়া শিখে মানুষ হও, পরে ও-সব হবে। আর দাদাও সেই জন্যে—" মঞ্জিষ্ঠা থামিয়া গেলেন।

মঞ্জিষ্ঠাকে নীরব হইতে দেখিয়া অনি বলিল—"থাম্‌লে যে দিদি?"

"কি আর বল্‌বো বল্? জ্যেঠতুতো ভাই হ'লেও, দাদাকে ঠিক সহোদরের মতই শ্রদ্ধা ক'র্‌তুম। বিশেষতঃ উর্ম্মিলা মাঝ-খানে এসেই যেন সেটাকে আরও ঘনিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল।" স্মৃতির বেদনায় মঞ্জিষ্ঠার বুকখানা কাঁপাইয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

মঞ্জিষ্ঠা অসাধারণ বাক্‌পটিয়সী ছিলেন, কিন্তু উর্ম্মিলা ও দাদার কথায় আজ তাঁহার ভাষা বাধিয়া যাইতেছিল। তাঁহার ভ্রাতৃ-স্নেহ দাদাকে বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিলেও, বন্ধুপ্রীতি যে উর্ম্মিলাকে রক্ষা করিবার জন্য মনের ভিতর একটা ঝড় তুলিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহা মঞ্জিষ্ঠার ঐ সংক্ষিপ্ত কয়েকটী কথার ভিতর দিয়াও অনির বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। উর্ম্মিলার জীবন ও

মঞ্জিষ্ঠা-দির দাদার অবিচার—এই দুইটি জিনিষকে যখন অনি পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দেখিল, সমস্ত পুরুষজাতির বিরুদ্ধে তাহার সারা অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। একজন ছুটিবে তাহার প্রার্থিত শরীরী দেবতার চরণপ্রান্তে জীবনের সব সম্পদ নিঃশেষে নিবেদন করিবার আকাঙ্ক্ষায়—আর অপর, সেই নিবেদিত-আত্মার উপায়ান্তর-হীনতার অবসর লইয়া, শুধু নিজের খেয়ালের নেশায় ছিনি-মিনি খেলিবেন—তাহার জীবন-মৃত্যুর সমস্যা লইয়া। ঊর্ম্মিলা ছিল মঞ্জিষ্ঠার আবাল্য বান্ধবী। ঊর্ম্মিলার প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে মঞ্জিষ্ঠা অন্তর দিয়া চিনিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় এই জায়গায় তাঁহার দাদাকে তিনিও ক্ষমা করিতে পারেন নাই। দাদা—তাঁহার সহোদর না হইলেও—সহোদর অপেক্ষা উচ্চ আসন পাতিয়াছিলেন মঞ্জিষ্ঠার হৃদয়ে, শুধু তাঁহার প্রিয়তমা বান্ধবী ঊর্ম্মিলার স্বামী বলিয়াই। আর সেই দাদার ভিতর দিয়া সমস্ত পুরুষজাতির স্বরূপ দেখিয়া আজ মঞ্জিষ্ঠা আমরণ কৌমার্য্যের সঙ্কল্প লইয়া নিজেকে শুধু দেশের কাজে নিবেদন করিয়া দিয়াছেন।

কথা-প্রসঙ্গে সেদিন মঞ্জিষ্ঠা বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই বলিয়াছিলেন—"অনি, মানুষকে চেনা বড়ই কঠিন। বন্ধু হোক্, আত্মীয় হোক্, স্বজন হোক্—দুনিয়ায় যে সব চেয়ে প্রিয় ও আপনার, তাকেও চেনা যায় না। মানুষ মানুষকে চিন্‌তে পারে না ব'লেই এমন পদে পদে ঠেক্‌ছে, বিশ্বাসের মূল আল্গা হ'য়ে পড়্‌ছে। বিশেষতঃ এই শিক্ষিত সমাজের লোকগুলোর বাইরের আবরণ যেন আরো বেশী পুরু; সহজে ভেদ করা যায় না।"

মঞ্জিষ্ঠা কথাগুলি একটু দুঃখের সঙ্গেই বলিয়াছিলেন, অনিও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিল তাহা কত সত্য।

১২৪

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া তাঁহারা একখানি গাড়ী ডাকিয়া উঠিয়া বসিলেন। অনি তখনো বোধ হয় অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল।

কোচম্যান্‌কে গন্তব্য স্থানের ঠিকানা দিয়া, মঞ্জিষ্ঠা পুনরায় বলিতে সুরু করিলেন—"আর একটা কথা কি জানিস অনু, মানুষ যতদিন না ঠেকে, ততদিন নিজের ভুল সে ধ'রতে পারে না। জ্যেঠামশায়ের বিরুদ্ধে কি হীন ধারণাটাই না মনে মনে পুষে রেখে-ছিলুম! তাঁকে দেখ্‌বার সৌভাগ্য অবশ্য জীবনে কোনো দিন হয় নি; কিন্তু ব্রাহ্ম হওয়ার জন্যে তিনি বাবাকে এমন শাসনই ক'রেছিলেন যে, দেশের বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ্‌বার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত জন্মের মত ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সব কারণে গোড়া থেকেই আমার মনটা জ্যেঠামশায়ের উপর বিগ্‌ড়ে ছিল। তার পর যখন দাদা কোলকাতায় পড়'তে এলেন, তখন সেটা একবারে চরম হয়ে দাঁড়ালো।"

কথাটা পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে না পারিয়া অনি প্রশ্ন করিল—"কেন? তোমার দাদাও বুঝি তোমাদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখ্‌তে পার্‌তেন না—তাঁর বাপের ভয়ে?"

মঞ্জিষ্ঠা বলিল—"না; সে রকম নিষেধ অবশ্য জ্যেঠামশায়ের ছিল না। তবে দাদার উপরেও তাঁর যে রকমের কড়া শাসন দেখতুম, তাতে মনে হ'ত যেন জ্যেঠামশায়ের সবই বাড়াবাড়ি। বাবার কাছেও সে কথা দু'-একদিন তুলেছিলুম; কিন্তু বাবা সেগুলো মোটেই কাণে নেন নি। অদ্ভুত! বড় ভাই তাঁকে দেশছাড়া ক'রেছিলেন, অথচ বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে একটি কথাও তিনি কখনো ব'ল্‌তে দিতেন না।

"আমি যেদিন বাবাকে গিয়ে ব'ল্লুম—'বাবা, আমার মনে হয় জ্যেঠামশায় বোধ হয় খুব বেশী লেখাপড়া শেখেন নি ব'লেই তিনি আধুনিক সভ্যতা ও চাল-চলনের ওপর অত চটা; এর প্রকৃত আলোকটুকু বোধ হয় তাঁর অনুভব ক'রবার ক্ষমতা নেই।'—তখন বাবা কি বল্লেন, জানিস? তিনি রাগে আগুন হ'য়ে বলে' উঠলেন—'মঞ্জু, তোমরা মস্ত ভুল ক'র্চো। দাদাকে তুমি চেন না ব'লেই এ কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। তাঁর মত জ্ঞানী ও সরল লোক দু'টি নেই। স্নেহ-ভালবাসাও তাঁর অফুরন্ত আছে; কিন্তু কর্ত্তব্যকে তিনি সকলের উপরে স্থান দিয়ে রেখেচেন'।

"আমার সঙ্গে তখন দাদার ঘনিষ্ঠতাটা খুবই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সবের ভিতর দাদারও অনেকখানি যোগ ছিল। তার জন্তেই বোধ হয় আমি অতবড় ভুল ক'রে ব'সেছিলুম।"

আরও কি একটা কথা বলিতে গিয়া মঞ্জিষ্ঠা হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

মঞ্জিষ্ঠার পিতা সরোজচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত ও পদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ লইয়া অগ্রজের সহিত মনোমালিন্য হইলেও, সরোজবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রতি কখনো শ্রদ্ধাহীন হইতে পারেন নাই। তিনি সারা জীবন কলিকাতাতেই কাটাইয়াছিলেন। দেশের সম্পত্তি ও বাড়ী-ঘর সমস্তই ত্যাগ করিয়া, তিনি দাদার শাসন মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন। সরোজবাবু যে সঞ্চিত অর্থ ও কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন, একমাত্র কন্যা মঞ্জিষ্ঠার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল।

পিতার জ্ঞান, উদারতা ও বিবেচনার উপর মঞ্জিষ্ঠার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও সে তখন জ্যেষ্ঠতাত সম্বন্ধে পিতার অভিমতগুলি

মানিয়া লইতে পারে নাই। সে ভাবিত—"দাদার ব্যবহার কত সুন্দর! কত মোলায়েম! দাদাও তো সেই জ্যেঠামশায়ের ছেলে! কিন্তু নিশ্চয়ই দাদার অন্তর এতো প্রশস্ত হ'য়েছে শুধু শিক্ষার গুণে। এমন শিক্ষিত ও সুসভ্য ছেলেকেও যে জ্যেঠামশায় জবরদস্তি ক'রে চালাতে চান, সেটা কেবল তাঁর একগুঁয়েমী।"

দাদার মার্জ্জিত রুচি ও মোলায়েম ব্যবহার মঞ্জিষ্ঠাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য জ্যেঠামহাশয় কেন, যে-কোন অভিভাবকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেও বোধ হয় মঞ্জিষ্ঠা পশ্চাৎপদ হইত না।

কিন্তু আজ আর মঞ্জিষ্ঠা সে দাদাকে সমর্থন করিতে পারে না, তাঁহার বিরুদ্ধে মঞ্জিষ্ঠার সমস্ত অন্তঃকরণ আজ ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দাদার বাহিরের সে আবরণটা যে ভিতরের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ্‌ছাড়া, তাহা মঞ্জিষ্ঠা পূর্ব্বে কখনো কল্পনাও করিতে পারেন নাই। সামান্য কারণে, এমন কি অকারণে, মানুষ যে এত বড়ো একটা বিপ্লব বাধাইয়া তুলিতে পারে; নিজের খেয়ালে পরের জীবন পর্য্যন্ত পথের ধূলার মত উড়াইয়া দিতে পারে, তাহা মঞ্জিষ্ঠা ভাবিতেও পারে নাই।

উর্ম্মিলার সম্বন্ধে কথাটা আরও পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অনি অনেকক্ষণ হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। মঞ্জিষ্ঠা নিজে হইতে কথাটা সম্পূর্ণ খোলাখুলি ভাবে বলিল না দেখিয়া এবার অনি দুই-একটা ঢোক গিলিয়াই প্রশ্ন করিয়া বসিল —"আচ্ছা দিদি, উর্ম্মিলার চরিত্রের উপর অতবড় একটা কুৎসিত সন্দেহ ক'রবার কারণ কি? তিনি কি কারো সঙ্গে তেমন মেলা-মেশা ক'র্‌তে দেখেছিলেন তাকে?"

"দাদা সেই হীন সন্দেহটা প্রকাশ ক'রেছিলেন প্রোফেসর এন, চৌধুরীর সম্বন্ধে ; অথচ প্রোফেসর চৌধুরীকে দাদা কোনো দিন চোখেও দেখেন নি। সুতরাং সে-রকম সন্দেহ হবার কারণ কি, তা দাদাই জান্‌তেন। উর্ম্মিলা মেলামেশা তেমন কারো সঙ্গেই কখনো করে নি। একমাত্র প্রোফেসর এন্, চৌধুরীর সঙ্গেই সে মিশতো বটে, কিন্তু তার মাঝখানে তো আমরাই ছিলুম—আমি আর নীলিমা। আর সেই মেলামেশারই বা এমন কি গুরুত্ব ছিল! উর্ম্মিলা বরং আস্‌তে রাজী হ'ত না ; কেবল আমি আর নীলিমা তাকে ক'দিন জোর ক'রে নিয়ে গেছলুম আলিপুর গার্ডেনে, আর বায়স্কোপে। তাতে যে অপরাধের কি হ'য়েছিল, তা বুঝ্‌তে পারি নি বোন। মাঝ থেকে আমরাও নিমিত্তের ভাগী হ'য়ে রইলুম।"

মঞ্জিষ্ঠার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

তাহার হাঁটুর উপর ডান-হাতখানি রাখিয়া অনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"প্রোফেসর এন্, চৌধুরীটি কে দিদি ?"

দুঃখের ভিতরেও মঞ্জিষ্ঠার গাল দুইটী নিমেষে একবার লাল হইয়া উঠিল ; একটা সলজ্জ বক্র-দৃষ্টিতে অনির মুখের দিকে চাহিয়া সে ছোট্ট করিয়া বলিল—"আমার বন্ধু"। তাহাদের সম্বন্ধটুকু জানিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। অনিরও বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

গাড়ী মহিলা-নিবাসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মঞ্জিষ্ঠা ভাড়া মিটাইয়া দিয়া অনির হাত ধরিয়া ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল।

উপরে উঠিতে উঠিতে অনি মঞ্জিষ্ঠার হাতে একটু চাপ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি, জীবনটা কি এমনি কাটবে ; বিয়ে থা' ক'রবে না ?"

মঞ্জিষ্ঠা বেশ সহাস্য অথচ দৃঢ়ভাবেই উত্তর দিল—"মনের বিয়ে কি দেহের বিয়ের চেয়ে ছোট অনি? স্ত্রী হওয়ার চেয়ে সহধর্ম্মিণী হ'য়ে জীবন কাটানো কি কম তৃপ্তির? যাঁকে ভালোবাসি—তাঁর জীবনের ব্রত ও উদ্দেশ্যকে মনে-প্রাণে বরণ ক'রে নিতে পা'র্‌লেই নিজেকে সার্থক মনে ক'রবো।" কথাটা অনির শিরায় শিরায় যেন একটা ঝঙ্কার তুলিয়া বাজিয়া উঠিল।

২০

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া—প্রথমে সুলতার অসুখ, পরে কাজের চাপ—ইত্যাদি নানা কারণে বনবিহারীবাবু মেজরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার উপর একে একে দিনগুলি যতই কাটিয়া যাইতেছিল, বনবিহারীবাবুর মনে ততই যেন অকারণ দুর্ব্বলতা গড়িয়া উঠিতেছিল। মেজরের অনুপস্থিতিতে অনিকে তাঁহার আশ্রয় হইতে লইয়া যাওয়া সঙ্গত হইয়াছে কি না, বনবিহারীবাবু তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। বনবিহারীবাবু যাহা করিয়াছেন, তাঁহার দিক হইতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও অকলঙ্ক হইলেও, মেজর যে সেটাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহা বলা যায় না। মেজরের মনে যদি এ সম্বন্ধে কোন কুৎসিত ধারণা হইয়া থাকে, বনবিহারীবাবু সে ধারণা ভাঙিবার চেষ্টাও করিতে পারিবেন না। তিনি বনবিহারীবাবুকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন, বনবিহারীবাবু এ লাঞ্ছনা কখনই সহ্য করিতে পারিবেন না।

দেখিতে দেখিতে অনেক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

বনবিহারীবাবু ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি মেজরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কি না!

কয়েক দিন পরে বনবিহারীবাবু অনির একখানি পত্র ও প্রেরিত মণিঅর্ডার পাইলেন। মণিঅর্ডারের টাকা লইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না থাকিলেও, তাহা ফেরৎ দিতে পারিলেন না। কারণ, তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে—তাঁহার নিকট অনি ঋণী হইয়া থাকিবে না। তিনি প্রত্যাখ্যান করিলে সে হয় তো আরও ব্যথিতা হইবে। অনিকে তিনি ভাল ভাবেই জানিয়াছিলেন; তাই বনবিহারীবাবু টাকা গ্রহণ করিলেন। গ্রহণে বিশেষ অতৃপ্তি বোধ করিলেও, অনি যে তাহার জীবিকা অর্জ্জনের একটা উপায় করিয়া লইতে পারিয়াছে, এইটুকু জানিয়া তাঁহার মনে অনেকটা তৃপ্তি হইল।

অনি তাহার পত্রে মেজরের সংবাদ লইতেও ভুলে নাই। পূর্ব্বে মেজরের প্রতি অনির যে দারুণ বিতৃষ্ণার ভাব বনবিহারীবাবু লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, অনি মেজরের খোঁজ-খবর লওয়ার বিষয়ে এরূপ সতর্ক থাকিবে। অনির পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া, তাঁহার সহসা যেন নিজের কর্ত্তব্যের প্রতি খেয়াল হইল। সব বিপদ আপদ ও দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও কর্ত্তব্যকে কিরূপে বাঁচাইয়া রাখিতে হয়, তাহা অনির পত্রের কয়েকটী ছত্র হইতেই তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

সেই দিন বিকালেই বনবিহারীবাবু মেজরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন।

বনবিহারীবাবু যখন মেজরের কোয়ার্টারে আসিয়া পৌঁছিলেন,

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; বাহিরের ঘরে আলো জ্বালা হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াই বেয়ারা শিউকিষণ সসম্মানে কুর্ণিশ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। শিউকিষণ বনবিহারীবাবুকে ভাল ভাবেই চিনিত। তিনি তাহার কুশল প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাহেব হ্যায়?"

শিউকিষণ একটা ঢোক গিলিয়া একটু বিষণ্ণ ভাবে উত্তর দিল —"সাহেব তো হিঁয়াসে বদ্‌লি হো গিয়া হুজুর! আজম্‌গড়।"

"কব্!" বনবিহারীবাবু যেন হঠাৎ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। মেজর এত শীঘ্র সহসা বদ্‌লি হইয়া গেলেন কেন, তিনি তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না। সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া লইবার জন্য আর একবার বেশ স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাহেব—মেজর এ, রায়?"

"হাঁ হুজুর!" শিউকিষণের কণ্ঠস্বর যেন একটু ভারি হইয়া উঠিতেছিল। ব্যথিত বেয়ারা জানাইল: সে তাহার বার্দ্ধক্যের জন্য সাহেবের সঙ্গে আর নূতন জায়গায় যাইতে পারে নাই। শেষ বয়সে বিশ্বনাথ জীউর চরণ ছাড়িয়া কোথাও যাইবার ইচ্ছাও তাহার নাই। চাক্‌রী করিবার সখ তাহার মিটিয়া আসিয়াছে।

মেজর রায়কে শিউকিষণ অত্যন্ত স্নেহ করিত। চাকর হইলেও, তাহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় প্রভুকে সন্তানের ন্যায় ঘিরিয়া রাখিয়াছিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই মেজরের ট্রান্সফার্ হইবার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া, বনবিহারীবাবুর মনটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। শিউকিষণকে সকল কথা প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইলেও তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। চাকরের নিকট

প্রভুর ব্যক্তিগত জীবনের খোঁজ লওয়া সঙ্গত হইবে কি না, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।

শিউকিষণ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল—"আঃ দেওতাকে মাফিক্ আদ্‌মি—একদম্ ঐসা বন্ গিয়া!"

শিউকিষণের কথা কয়টা কাণে যাইতেই বনবিহারীবাবুর সঙ্কোচ ও দ্বিধার বাঁধ নিমেষে ভাঙিয়া গেল। বেয়ারার পিঠের উপর হাত দিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"শিউকিষণ, মেজরকা খবর সব্ আচ্ছা তো?"

"নেই হুজুর!" বৃদ্ধের চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিতেছিল।

বনবিহারীবাবু আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। মেজরের খবর ভাল নয়, শুনিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শিউকিষণকে আরও নিকটে টানিয়া লইয়া তিনি মেজরের সম্বন্ধে সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ব্যথিত হৃদয়ে বেয়ারা বলিয়া চলিল—তাহার প্রভুর সেই কল্পনাতীত পরিবর্ত্তনের কথা। বৃদ্ধের শীর্ণ গণ্ডস্থল চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছিল।

বৃদ্ধের নিকট মেজরের সম্বন্ধে যাহা শুনিলেন, তাহাতে বনবিহারীবাবুর অন্তর শুকাইয়া উঠিল। সেই মেজর,—অত স্থির, দৃঢ় ও কর্ত্তব্যপরায়ণ,—হঠাৎ যে তাঁহার এত দূর অধঃপতন হইতে পারে, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সরকারী কার্য্যে অবহেলা করার জন্যই মেজরকে ট্রান্সফার্ করা হইয়াছে।

শিউকিষণ্ সকল কথা পরিষ্কার ভাবে গুছাইয়া বলিতে পারিল না, যতটুকু বলিল, তাহাতেই বনবিহারীবাবু বুঝিলেন—মেজর কত নীচে নামিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি প্রায় চব্বিশ

ঘণ্টাই মদ খাইয়া মাতাল হইয়া পড়িয়া থাকেন ; সরকারী কার্য্যে একবারও বাহির হন না। বাহিরের ডাক তো দূরের কথা, হাসপাতালের জরুরী কাজে পর্য্যন্ত আজ দুই মাসের মধ্যে একটি দিনও বাহির হন নাই। নিয়মিত খাওয়া শোওয়া—সকল বিষয়ে যিনি অত তৎপর ছিলেন, সেই মেজর যে এখন নিজের শরীরের প্রতিও ওরূপ ভাবে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। অনি চলিয়া যাওয়ার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ও পরিবর্ত্তন মেজরের জীবনে ঘটিয়া আসিতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণটুকু বেয়ারার মুখ হইতে নিতান্ত অসংলগ্নভাবে শুনিলেও, বনবিহারীবাবুর চক্ষে যেন ইহার অন্তরের রহস্য আপনা-আপনি অনেকখানি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। মেজরের এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের সহিত যে অনির সেই বেনারস ত্যাগের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না। কিন্তু হঠাৎ কি বিষয় লইয়া এই বিপ্লব এতদূর গড়াইয়াছে তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

শিউকিষণের নিকট বিদায় লইয়া বনবিহারীবাবু সেখান হইতে ফিরিলেন। সারা পথ কেবল মেজরের কথাই তাঁহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতেছিল। বিশেষতঃ মেজরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার ভয় হইতেছিল। এই কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি নিউমোনিয়া হইতে কোনরূপে সারিয়া উঠিয়াছেন ; তাহার উপর ঐরূপ অপরিমিত অত্যাচার ও অনাচারের পরিণামফল যে অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বেনারসে থাকিতে বন্ধুবান্ধবগণের সাময়িক জবরদস্তিরও

যে ভয়টুকু ছিল, আজম্‌গড়ে গিয়া তাহারো বালাই থাকিবে না। সেখানে মদ খাওয়া হয়তো আরো পূরা দমেই চলিবে। তাঁহাকে জোর করিয়া ফিরাইবার কেহই নাই। চাকরেরা তাঁহার মতের বিরুদ্ধে—খাওয়া-দাওয়ার বিষয় পর্য্যন্ত লইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতে সাহস করিবে না।

বনবিহারীবাবুর ইচ্ছা হইতেছিল, সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে জানাইয়া অনিকে আসিবার জন্য লিখিয়া দিতে। মেজরের রোগ-শয্যায় তিনি বহুবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপর অনির বেশ একটা জোর আছে ; মেজরও অন্তরের সহিত অনির অসন্তুষ্টিকে ভয় করিয়া চলেন। সুরার স্বাভাবিক ধর্ম্মের ভিতর এমন আকর্ষণ আছে, যাহা সুরাপায়ীকে নিঃশেষে আপনার মধ্যে টানিয়া লয়। এই আসক্তির হাত হইতে মানুষকে টানিয়া তুলিতে হইলে, এমন একটা শক্তির দরকার হয়, যাহার নিকট সুরার আকর্ষণ আপনা-আপনি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। মেজরকে ফিরাইতে হইলে ঠিক সেই শক্তিরই প্রয়োজন। অনির শাসনকে মেজর কখনই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না ; তাঁহাকে ফিরাইবার লোকও বোধ হয় এক অনি ব্যতীত আর কেহই নাই। দেশেও যে মেজরের কোন নিকট আত্মীয়-স্বজন নাই, তাহা তিনি মেজরের অসুখের সময়েই জানিয়াছিলেন।

বনবিহারীবাবু কোন কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অনিকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বিশেষ কিছু ফল হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। কারণ, যেরূপে অনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার ভাব-ভঙ্গীর মধ্যে মেজরের প্রতি যে বিতৃষ্ণার ভাব তিনি পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার

ন্যায় তেজস্বিনীর গতিকে পুনরায় আকর্ষণ করা সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। আত্মসম্মান-জ্ঞান অনির অত্যন্ত প্রবল। বনবিহারীবাবু তাহাকে যতখানি চিনিয়াছিলেন, তাহাতেই স্থির জানিয়াছিলেন যে, তিনি কেন, সমস্ত বিশ্বের অনুরোধও অনিকে ফিরাইতে পারে কি না সন্দেহ। নিজের কর্ত্তব্যের বিষয়ে সে যেরূপ সতর্ক, আত্ম-সম্মান বাঁচাইয়া চলিতেও তদ্রূপ। পরের জন্য সে যেমন নিজেকে বিলাইয়া দিতে জানে, প্রয়োজন হইলে ঠিক সেইরূপে নিজেকে গুটাইয়া লইবার ক্ষমতাও তাহার আছে। সামান্য কারণে অনি কখনই বিচলিতা হয় না। কিন্তু বেনারস হইতে চলিয়া যাইবার সময় তাহার অত্যন্ত বিচলিত ভাব বনবিহারীবাবু লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সে কথা মনে হইতে আজ তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার মধ্যে নিশ্চয় কোন একটা গুরুতর বিষয় ছিল। সে ক্ষেত্রে তাহাকে আবার ফিরাইবার জন্য অনুরোধ করা হয় তো তাঁহার উচিত হইবে না। তাহাতে অনি আরও ব্যথিতা হইয়া পড়িতে পারে।

বনবিহারীবাবু যখন বাসায় ফিরিলেন, তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। সুলতা তখনো তাঁহারই অপেক্ষায় জাগিয়া বসিয়াছিল। বনবিহারী-বাবু কোন সাড়া না দিয়া চুপি চুপি ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন। বান্ধবী-বিরহ-বিধুরা লতি নিবিষ্ট চিত্তে অনির পত্রখানি লইয়াই নাড়া-চাড়া করিতেছিল; তাহার চোখ দুইটি যেন তখন বেদনায় ম্লান হইয়া গিয়াছে।

বনবিহারীবাবুকে দেখিয়াই, সুলতা তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—"এত দেরী যে? ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে খুব একচোট ঝগড়া ক'রে এলে বুঝি?"

"না, মেজরের সঙ্গে দেখাই হ'ল না। তিনি আজমগড়ে বদ্‌লি হ'য়ে গেছেন।"

বনবিহারীবাবু ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িলেন।

সুলতা বেয়ারাকে চায়ের জল গরম করিতে বলিয়া, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিল।

বনবিহারীবাবু বলিলেন, "শুন্‌লুম, মেজরের আশ্চর্য্য রকম অধঃপতন হ'য়েছে। তিনি আজকাল চব্বিশ ঘণ্টা মদ খেতে সুরু ক'রেছেন, কাজকর্ম্ম কিছুই দেখেন না। আমার কাছে ব্যাপারটা যেন একটা হেঁয়ালি ব'লে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, যাবার আগে অনি তোমায় মেজরের সম্বন্ধে বা তার যাওয়া নিয়ে কিছু বলে'ছিল কি?"

"কৈ, না তো। তবে আমার মনে হ'চ্ছিল—তিনি বোধ হয় ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে রাগারাগি ক'রে চলে' যাচ্ছিলেন।"

"সে তো বোকারাও বুঝ্‌তে পেরেছিল। যাক্, মনে ক'র্‌ছি অনিকে একবার আস্‌তে লিখ্‌বো।"

বনবিহারীবাবু জামা-কাপড় ছাড়িবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন।

২৭

সর্ব্বহারার জীবনে অতুল সম্পদের মত, কণা অনির নিঃস্ব বুকখানিকে অল্প দিনের মধ্যেই ভরিয়া তুলিল। মাতৃহীনা কণাকে সর্ব্বস্নেহে বুকে জড়াইয়া অনি তাহার সকল বেদনা ভুলিয়া গেল। সমাজ শাসন-শৃঙ্খলে অনির সমস্ত সম্পদকে বাঁধিয়া তাহার জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিলেও, অনির নারী-হৃদয়ের সেই জন্মগত

সম্পদ—মাতৃত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার অটুট হইয়া বাঁচিয়া ছিল। আজ কণাকে বুকে পাইয়া যেন অনির সেই অতুল সম্পদ আপন তরঙ্গে জীবনের কূল ছাপাইয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেখানে বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, সঙ্কোচ নাই; আছে শুধু জীবন-ভরা তৃপ্তি। সেই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব তৃপ্তিতে অনির জীবন আবার সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল।

কণা অনিকে 'গুরু-মা' বলিয়া ডাকিত। কিন্তু সেই বৃন্তচ্যুত ছোট ফুলটির মত—মাতৃহীনা কণাকে কোলের কাছে পাইয়া অনির অন্তরের চিরবঞ্চিতা জননী 'মা' হইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। অনি সবলে সকল সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙিয়া কণাকে শুধু "মা" বলিয়াই ডাকিতে শিখাইয়াছিল। জীবনের মরুপথে যে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক ক্লান্ত চরণে উদ্দেশ্যহারার মত চলিয়াছিল, আজ সহসা এক সুশীতল শান্তি-উৎসের সন্ধান পাইয়া সে তো আর নিজের সেই পিপাসিত অন্তরকে বঞ্চিত রাখিতে পারে না। সকল বন্ধন ভাঙ্গিয়া তাহার তৃষিত প্রাণ ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে, সেই উৎসধারায় আপনাকে স্নাত ও স্নিগ্ধ করিয়া লইবার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষায়।

এই নূতন পরিবারের মধ্যে আসিয়া অনির দিনগুলি বেশ ভালই কাটিতেছিল। নীলিমার সাহচর্য্য, মঞ্জিষ্ঠার বন্ধুপ্রীতি ও কণার মাতৃত্বের অধিকারটুকু পাইয়া তাহার জীবন যেন আবার সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। অনির সকাল সন্ধ্যা কাটিত নীলিমা ও কণাকে লইয়া; দুপুরে সে মঞ্জিষ্ঠার সহিত বাহির হইয়া পড়িত —সমিতির কাজে; সপ্তাহে দুই দিন করিয়া সরোজনলিনী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে যাইত। শূন্য জীবনের ফাঁকগুলি এই

সব কাজের ভিড়ে ভরিয়া উঠিয়া তাহার অন্তরের বেদনাকে যেন অনেকখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। দুশ্চিন্তা আর সারাক্ষণ তাহার বুকের উপর গুরুভারের মত চাপিয়া থাকিবার অবসর পাইত না। কিন্তু তাহার নিয়মিত কার্য্যের অবসর-সময়ে অনেকের কথাই মনে পড়িত। পশ্চিমের স্মৃতিকে অনি সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। সুলতা, বনবিহারী, মেজর, রয়, শিউকিষণ প্রভৃতি সকলের কথাই তাহার মনে হইত। মেজরের স্মৃতিকে অনি চেষ্টা করিয়াও মন হইতে সরাইতে পারে নাই। যাঁহার নিকট সে সহস্ররূপে ঋণী, যাঁহার উদার মহত্ত্ব হইতে সে জীবনে অনেক কিছু পাইয়াছে, ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় একটী মাত্র ভুলের ভারে কি সেই মেজরের সকল গৌরব ডুবিয়া যাইবে! যখনই মেজরের কথা মনে হইয়াছে, অনি শুধু এই কথা লইয়াই বহু-বার আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মেজরের কথা ভাবিতে গেলে, সেই পরিচয়ের প্রথম দিনটী হইতে—দাদুর অসুখের কথা, তাঁহার অন্ত্যেষ্টি, নিজের আশ্রয়হীনতা—মেজরের সহৃদয়তা ও দৈনন্দিন ব্যবহার প্রভৃতি প্রত্যেকটী ঘটনা যেন অনির চক্ষে চলচ্চিত্রের মত ভাসিয়া উঠে। যখনই সে অন্তরের সহিত আগা-গোড়া ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে—তখন আর সে মেজরকে অশ্রদ্ধা করিতে পারে নাই। আবার পর মুহূর্ত্তেই হয় তো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সব কিছুকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।

অনি যতক্ষণ বাসায় থাকিত, নীলিমা প্রায় সকল সময়ের জন্যই তাহার কাছে কাছে থাকিত। নীলিমা ঠিক সুলতার মতই তাহার একটী স্নেহপরায়ণা বান্ধবী হইয়া উঠিয়াছিল। তবে সুলতার স্বভাবের সঙ্গে নীলিমার স্বভাবের একটা মস্ত পার্থক্য

আছে। সুলতা সংসারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, ছোট্ট বালিকা-টীর মত সরলা। সে যেন অনিকে কাছে পাইলেই নিজের সর্ব্বস্ব অনির ঘাড়ে চাপাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। অনির উপর নির্ভর করিতে পারিলেই সুলতা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত। আর নীলিমা ছিল ঠিক তার বিপরীত। সে অনির চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হইলেও, অনির আহার নিদ্রা সকল বিষয়েই রীতিমত অভিভাবকত্ব করিতে ছাড়িত না। অনিও তাহার এই স্নেহের শাসনকে খুব আনন্দের সঙ্গেই মানিয়া চলিত। নীলিমার স্বভাবের মধ্যে বিন্দুমাত্র কঠোরতা ছিল না। বিধাতা তাহার দেহখানিকে যেরূপ অতুলনীয় সৌন্দর্য্য-সম্ভারে সাজাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার অন্তরখানিকেও সেইরূপ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিশেষ লেখাপড়া না জানিলেও নীলিমা বুদ্ধিমতী ও নিপুণা ছিল। সুরথবাবুর ক্ষুদ্র সংসার খানিকে সে যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দময় শান্তিনিকেতন করিয়া রাখিয়ছিল।

গৃহশিক্ষয়িত্রী রূপে অনি যেদিন প্রথম আসিয়া এই পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিল, সেদিন সে মনে মনে অনেক আশঙ্কা লইয়াই আসিয়াছিল। অন্ন-সমস্যা বিষয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেও, নিজের সম্মান-সমস্যা লইয়া অনি আর এখন অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া পারিত না। বিশেষতঃ সুরথবাবু যে সর্ব্বদাই বাড়ীর মধ্যে থাকেন, ইহা অনির নিকট ভাল লাগে নাই। সাধারণ পুরুষকে সে যেন এখন মনে মনে একটু ভয় করিয়া চলিত। কিন্তু অনির সে সঙ্কোচটুকু কাটিয়া যাইতে বেশী সময় লাগিল না। সুরথ-বাবুকে সে অল্প দিনের মধ্যেই চিনিয়া ফেলিল। সর্ব্বদা

বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও সুরথবাবুর সহিত তাহার দিনান্তে ক্বচিৎ সাক্ষাৎ হইত। তিনি সর্ব্বক্ষণ লেখাপড়া লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সীমানা ছিল শুধু লাইব্রেরী আর নিজের শয়নকক্ষটিকে লইয়া। বিশেষ কোনো প্রয়োজনে হঠাৎ সেই গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তাঁহার ছিল না; পড়াশুনার নেশা সুরথবাবুকে সর্ব্বদার জন্য এতই মাতাল করিয়া রাখিয়াছিল যে, নিজের প্রয়োজন অপ্রয়োজন বুঝিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার লোপ পাইয়াছিল। এতো সমৃদ্ধি ও এরূপ পরমাসুন্দরী স্ত্রীকে পাশে রাখিয়াও যে মানুষ এমন নির্ব্বিকার ভাবে পড়ার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারে, তাহা এই সুরথবাবুকে দেখিবার পূর্ব্বে অনি কখন কল্পনাও করিতে পারিত না।

সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন স্বামীকে লইয়া নীলিমা যখন অত্যন্ত বিরক্ত হইত, তখন সে মাঝে মাঝে আসিয়া অনির নিকট নানা অভিযোগ করিত। নীলিমার অধিক রাগ ছিল, ঐ রাশি-রাশি বইএর উপর। ঐ সব কাগজ আর কালির দাগগুলির মধ্যে এমন কি আছে, যাহা তাহার স্বামীকে এরূপভাবে আকর্ষণ করিয়া রাখে—তাহা নীলিমা ভাবিয়া পাইত না। স্বামীর খাওয়া-পরা হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারের যাবতীয় বিষয়ের ভার পড়িয়াছিল তাহারই হাতে; এমন কি সুরথবাবুর সহিত কোনো পরামর্শ-টুকু পর্য্যন্ত করিবার অবসর সে পাইত না। নিতান্ত প্রয়োজনে পড়িয়া স্বামীর নিকট কোন জরুরী পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেও, তিনি পুস্তকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতেই বলিতেন—"আচ্ছা"।

এই "আচ্ছা"র সঙ্গে হয় তো পত্নীর প্রস্তাবিত বিষয়ের কোন সামঞ্জস্যই খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

নীলিমা সেদিন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অনির নিকট বলিয়া ফেলিয়াছিল—"দিদি, ওই মুখপোড়া বইগুলোর উপরে আমার রাগে গা জ্বলে যায়; আমার মনে হয়—ওরা আর-জন্মে আমার সতীন ছিল। ইচ্ছে করে সবগুলোকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে, পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলি।"

নীলিমার কথা শুনিয়া অনির হাসিও পাইতেছিল, দুঃখও হইতেছিল। আহা, বেচারী! স্বামীকে এত কাছে পাইয়াও তাহার পাওয়ার পরিপূর্ণতা হইতেছে না। সুরথবাবুর উপর অনিরও সময় সময় রাগ হইত; পার্শ্বস্থা নারী পুরুষের অধিক মনোযোগ পাইলেও যেরূপ সঙ্কুচিতা হইয়া পড়ে, সম্পূর্ণ অমনোযোগেও তাহা অপেক্ষা কম আহতা হয় না। ধ্যানমগ্ন পুরুষ যখন আপন সাধনায় তন্ময় থাকিয়া নারীর পানে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসরও পান না, তখন নারীর অন্তরের সেই উপেক্ষিতা উর্ব্বশী দলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠে। পুরুষকে ভয় করিয়া চলিলেও, তাহাকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা নারী আমরণ ছাড়িতে পারে না। অনির মনে হইত: সুরথবাবুর সকলই বাড়াবাড়ি।

নীলিমা ও অনি—কেহই সুরথবাবুর উপর বিরক্ত হইয়া থাকিতে পারিত না। যিনি নিজের বিষয়ে অত উদাসীন, তিনি যে পরের দিকে লক্ষ্য রাখিবার অবসর পাইবেন না, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! মাঝে মাঝে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেও, নীলিমা যে স্বামীকে লইয়া খুব সুখী হইয়াছিল, তাহা অনি তাহার

প্রত্যেক কার্য্যেই বুঝিতে পারিত। সুরথবাবু ছিলেন নীলিমার আদরের খেলার পুতুল। ধ্যানমগ্ন স্বামীর উপর সে একাধিপত্য পাইয়াছিল। তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতিটুকু পর্য্যন্ত নীলিমাকেই অনুমান করিয়া লইতে হইত। সুরথবাবুর জামা-কাপড়ের প্রয়োজন বুঝিয়া নীলিমাকেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইত। সাংসারিক কোনো কিছুতে স্বামীর মতামত লইবার সুযোগও তাহার ঘটিত না। কিন্তু সেই সাধক স্বামীর 'দর্শন-বেদান্তের' গণ্ডীর বাহিরে পরিমিত বিশ্রাম-অবসরে নীলিমা যে অপরিমেয় ভালবাসা পাইত, তাহাতেই তাহার নারী-হৃদয় সার্থকতার গৌরবে ভরিয়া যাইত। স্বামীর সেই অনাবিল প্রেম তাহার জীবন পাত্রের কাণায় কাণায় ছাপাইয়া উঠিত।

অনি আসিবার পর হইতে নীলিমার অনেকখানি অভাব ও অসুবিধা দূর হইয়াছিল। এখন সে আর স্বামীকে সময়-অসময়ে অকারণ বিরক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া অনির সঙ্গেই সকল বিষয়ের পরামর্শ করিত। অভিভাবিকা নীলিমা স্বামী ও অনির উপর সমভাবে কর্ত্রীত্ব করিয়া চলিলেও, বস্তুতঃ সেই বালিকা নীলিমাকে সংসার-জীবনে পরিচালিত করিবার সকল ভার সম্পূর্ণরূপে অনির হাতেই পড়িয়াছিল।

অনির তুলনায় নীলিমা অন্যান্য বিষয়ে অল্পশিক্ষিতা হইলেও সঙ্গীত-শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। অনি আদৌ গান গাহিতে পারিত না। নীলিমা এই সুযোগ লইয়া অনিকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। নানা ওজর আপত্তি দেখাইয়াও অনি নিষ্কৃতি পাইল না। মেজর তাহাকে গান শিখিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়া রাজী

করিতে পারেন নাই; কিন্তু নীলিমা তাহাকে জোর করিয়া প্রত্যহই হারমোনিয়মের পাশে টানিয়া আনিতে ছাড়িত না। অনির অত্যন্ত লজ্জা করিত; নীলিমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কণাও যে সকল গানে পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, ধাড়ী ছাত্রী হইয়া সেই সকল প্রাথমিক স্বরলিপি তাহাকে নূতন করিয়া সাধিতে হইবে। কিন্তু নীলিমা ছাড়িবার পাত্রী নহে। অনির নানারূপ আপত্তিতে শেষে নীলিমা তাহাকে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটী গানের 'স্বরলিপি' শিখাইতে আরম্ভ করিল, যেগুলি কণা জানে না। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কাজ হইল না। অনি কোনমতেই নিঃসঙ্কোচে গলা ছাড়িয়া দিয়া সুর সাধিতে পারিত না। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে গাহিতে বসিয়া, অন্যমনস্কভাবে হারমোনিয়মের চাবি টিপিতে টিপিতে যেই সে ভুল করিয়া বসিত, অমনি কণা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিত—"মা-মণি, 'নি—সা—ধা নি পা—' করো।" সঙ্গে সঙ্গে অনির গান থামিয়া যাইত। সে কণাকে টানিয়া লইয়া হারমোনিয়মের কাছে বসাইয়া দিয়া বলিত—"তুমি গাও তো মাণিক।" অনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত।

সেদিন কণাকে তাহার মামাবাবুর সহিত বেড়াইতে পাঠাইয়া, নীলিমা পুনরায় অনিকে লইয়া সুর সাধাইতে বসিয়াছিল। নীলিমার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নহে জানিয়াই অনি বাধ্য হইয়া তাহার নির্দ্দেশ মত স্বরলিপি সাধিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু সে মনোযোগ দিতে পারিতেছিল না; গানের প্রথম চরণের শেষ ছত্রটির নিকটে আসিয়াই অনি অভ্যস্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল।

আমি আপনার হাতে মূরতি তোমার
ভাঙিয়া ফেলেছি দেবতা গো।

নীলিমা সযত্নে বহুবার ধীরে ধীরে দেখাইয়া দিলেও, অনি কোন রূপেই এই স্বরলিপিটুকুকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছিল না। নীলিমা এই কথা কয়টার গতিভঙ্গী ও সুরের লীলা বার-বার বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে শিখাইবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, অনি যেন ততই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। অনির উদাস ভাবটা বেশ স্পষ্ট হইয়া নীলিমার চোখে পড়িলেও, সে ইহার কোনো তাৎপর্য্যই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। অনি তাহার শিক্ষকতাকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য হয় তো এরূপ অবহেলা করিতেছে—এই ভাবিয়া নীলিমা ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

ঝি সদর হইতে একখানি পত্র আনিয়া অনির হাতে দিল। অনি খামের উপরের লেখা দেখিয়াই বুঝিল—পত্র বনবিহারীবাবু দিয়াছেন। সে অনেকক্ষণ হইতে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে-ছিল, কিন্তু কেবল নীলিমার ভয়ে উঠিতে পারিতেছিল না! পত্রখানি হাতে পাইয়াই অনি নাড়াচাড়া করিতে করিতে সেই অছিলায় উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। নীলিমা একবার তাহার দিকে চাহিল মাত্র, কিন্তু কোন কথা বলিল না। সে তখন আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিতেছিল।

অনি ঘরে আসিয়া বনবিহারীবাবুর পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িল। বনবিহারীবাবু পত্রে মেজরের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া অনির অন্তর দুঃখে ও আতঙ্কে ভরিয়া উঠিল। এ কি! সেই মেজরের এ কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! মেজর আজম্‌গড়ে বদ্‌লি হইয়া গিয়াছেন। অনিয়ম, অত্যাচার ও অতিরিক্ত সুরা-

পানে তাঁহার স্বাস্থ্য একবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বনবিহারীবাবু শিউকিষণের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, ও নিজে আজম্‌গড়ে গিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা সমস্তই বিস্তৃতভাবে অনির নিকট লিখিয়া জানাইয়াছেন। অনি পত্রখানি তিন চারিবার আগাগোড়া পড়িয়া দেখিল। একটা বেদনার আঘাতে তাহার সমস্ত হৃদয় যেন তখন তালবৃন্তের মত থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল। সে চলিয়া আসার পর হইতে, এই যে মেজর প্রতি পলে পলে তাঁহার মূল্যবান জীবনটাকে একেবারে অধঃপতনের চরম সীমায় টানিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য দায়ী কে? সেই মেজর! দাদামশায়ের মৃত্যুশয্যা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার অন্তিমের সংকার, বিপন্ন অবস্থায় অনিকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করা—সবই যিনি মুক্তহস্তে করিয়া ছিলেন; যাঁহার অনুগ্রহ ও সাহায্য না পাইলে, অনি তাহার দাদুর মৃত্যুশয্যায় একটু ঔষধ পথ্য দিতে পারিত না। সেই পরমাত্মীয় দাদুকে চিরদিনের মত বিদায় দিতে হইত—তাঁহার ব্যথাতুর ও অনশনক্লিষ্ট মুখখানির পানে চাহিয়া! মেজরের নিকট অনি যে সাহায্য পাইয়াছে, তাহা সে কোনো আত্মীয়-বন্ধুর নিকট হইতেও পায় নাই। অর্থ, সামর্থ্য, সমবেদনা—কোনো কিছু দিয়াই মেজর তাহাকে সাহায্য করিতে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করেন নাই। অত মহৎ, অত কর্ত্তব্যপরায়ণ, অত ধীর সেই মেজরের জীবনকে আজ সে কোথায় ঠেলিয়া ফেলিয়াছে! অত সুন্দর একটা জীবনের সব মহত্ত্ব ও সম্পদকে কি শুধু মাত্র বারেকের ক্ষণিক দুর্ব্বলতা চিরদিনের মত ভাসাইয়া লইয়া যাইবে! মানুষ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার কর্ত্তব্য ও মনুষ্যত্বকে বাঁচাইয়া চলিলেও—সে তো মানুষ! রক্ত-

মাংসের ক্ষুধাকে প্রাণপণ চেষ্টায় বাধা দিয়া রাখিলেও, তাহার শক্তি নিমেষের জন্য সেই অদম্য ক্ষুধার লেলিহান্ শিখায় বিকল হইয়া পড়িতে পারে। যাহাকে সজ্ঞানে মানুষ এড়াইয়া চলে, অজ্ঞানতার অবসর লইয়া যদি মুহূর্তের জন্য সেই পিপাসা মানুষকে জয় করিয়া বসে, তবে সেই মুহূর্তের পরাজয়-গ্লানি দিয়াই কি তাহার সমস্ত জীবনটাকে ওজন করিয়া লইতে হইবে!

অনি আত্মহারা হইয়া পড়িল। মেজর আহার নিদ্রা সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন, নিজের কর্ত্তব্যের প্রতি তাঁহার আর খেয়াল নাই। দিবারাত্রি সুরাপান করিয়া প্রতিদিন আত্মহত্যাকে যেন বরণ করিয়া লইতেছেন। বনবিহারীবাবু লিখিয়াছেন—এখন আর মেজরের চেহারা দেখিয়া তাঁহাকে চিনিবার উপায় নাই। তাঁহার জীবনের সবই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। বেতনের টাকায় তাঁহার সঙ্কুলান হয় না। প্রতি সপ্তাহে অজস্র টাকা ঋণ করিয়া চলিয়াছেন। শিউকিষণ্ সঙ্গে যায় নাই। নূতন চাকর যাহারা আসিয়াছে তাহারা প্রভুর এই দুর্গতির অবসর লইয়া দুই হাতে লুট করিয়া চলিয়াছে। এখনো হয় তো ফিরাইবার সময় আছে; আর কিছু দিন এইভাবে চলিলে, মেজরের জীবন যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহার ঠিকানা নাই। এখনো অনি চেষ্টা করিলে বোধ হয় তাঁহাকে ফিরাইতে পারে। একমাত্র অনি ব্যতীত আর কাহারো সে শক্তি আছে কি না সন্দেহ।

মুহূর্ত্তে অনির সমস্ত অভিমান ভাসিয়া গেল। অনি সঙ্কল্প করিল—যেমন করিয়া পারে সে যাইবেই। মেজরের ন্যায় একটা মহৎ প্রাণকে সে কিছুতেই ডুবিয়া যাইতে দিবে না। আজই সে রওনা হইয়া পড়িবে; মোগলসরাইএ তাহার সহিত সাক্ষাৎ

করিবার জন্য সে এখনই বনবিহারী-দাকে তার করিয়া দিবে। মেজরের জীবনকে যে সে-ই আপন হাতে অধঃপতনের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে, আপনার তৃষিত অন্তরকে সমাজের যূপকাষ্ঠে বলিদান করিয়া। অনি চিঠিখানাকে দুই হাতে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—"ওগো সমাজের নিষ্ঠুর দেবতা, তোমার পূজো ক'রতে গিয়ে, তোমারই সংস্কারের নাগপাশে আপনাকে বেঁধে রেখে—অন্তরের আরাধ্য ঠাকুরকে যে আজ আপন হাতে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দিয়েছি, তার জন্য দায়ী কে? ওগো নিষ্ঠুর, ওগো কঠিন! এ লাভ-লোকসানের হিসাব কি তুমি দিতে পার?"

বেদনায় অনির বুকখানা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল—তাহার চোখের জল তখন আর বাধা মানিতেছিল না। সেও যে মেজরকে ভালবাসিয়াছিল; এখনো হয় তো বাসে।

ড্রয়িংরুমে বসিয়া নীলিমা তখনো গাহিতেছিল। তাহার সেই সুললিত সুরের হিল্লোল সারা বাড়ী মুখর করিয়া তুলিতেছিল—

আমি আপনার হাতে মূরতি তোমার
ভাঙিয়া ফেলেছি দেবতা গো!··

সেই পাগল-করা দুইটি ছত্রের কঠোর ইঙ্গিত যেন অনির বুকের তলায় আবার শূলের মত বিঁধিল। বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া অনি বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে যে সাহারা পথের বেদুইন্! মরুপথের তৃষ্ণাতুর হইলেও, সে দস্যু। সে তৃষ্ণায় নিজে মরিতেছে, কিন্তু তাহারই সঙ্গে সুহৃদ, হিতৈষী বন্ধুকে—বিপন্ন জীবনের একমাত্র আশ্রয়দাতাকে·····!

আজম্‌গড়ে আসিয়া মেজর নূতন করিয়া আবার কাজকর্ম্মের চার্জ্জ বুঝিয়া লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কোনো পরিবর্ত্তনই তাঁহার হয় নাই। জীবনের গতি বেনারসেও যেরূপ চলিতেছিল, আজম্‌গড়ে আসিয়াও ঠিক সেইরূপ চলিতে লাগিল। পুরানো চাকর ও বাবুর্চ্চি কেহই মেজরের সঙ্গে আসে নাই। জিনিষপত্র লইয়া কেবলমাত্র বালক ভৃত্য ভগ্‌লু তাঁহার সহিত আসিয়াছিল। আজম্‌গড়ে আসিয়া মেজর নূতন কোনো বন্দোবস্ত করিলেন না। পূর্ব্বতন সিভিল-সার্জ্জনের চাকর-বাবুর্চ্চি যাহারা ছিল, তাহারাই আপন ইচ্ছামত মেজরের কার্য্যে লাগিয়া পড়িল ; মেজরের সে সব দিকে কোনো লক্ষ্যই ছিল না। নিজের খাওয়া-পরা বিষয়েও তিনি এতো উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বয় ও চাকরদের পুনঃ-পুনঃ তাগাদা সত্ত্বেও মেজর সে সম্বন্ধে আদৌ মনোযোগ দিলেন না। চাকরেরা নিজেদের জন্য ডালরুটি বানাইয়া লইত, কিন্তু মেজরের নির্দ্দিষ্ট কোনোরূপ আদেশ না পাওয়ায় তাঁহার জন্য কোনো ব্যবস্থা করিতেই সাহস করিত না। বেনারসে থাকিতে অনি নিজে কর্ত্রীত্ব করিয়া মেজরের খাওয়া-পরা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল, সে চলিয়া যাওয়ার পর বৃদ্ধ শিউকিষণ্‌ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা পালন করিয়া চলিত। মেজর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিলেও, বেয়ারা তাঁহার সর্ব্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিত না।

শিউকিষণের বয়স হইয়া আসিয়াছিল। প্রভুকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিলেও, শেষ বয়সে বাবা বিশ্বনাথের চরণ ছাড়িয়া সে আর নূতন জায়গায় বদ্‌লি হইতে চাহে নাই। মেজরের

পদে ডাঃ আয়ার বেনারসে বদ্‌লি হইয়া আসিলেন; শিউকিষণ্‌ তাঁহার কাজে নিযুক্ত হইয়া রহিল। সঙ্গে না আসিতে পারিলেও, প্রভুভক্ত ভৃত্যের স্নেহার্দ্র অন্তর যেন মেজরকে ছাড়িয়া দিবার সময় হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। মেজরের সেই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া শিউকিষণ্‌ আরও ব্যথিত ও চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভগ্‌লুকে কাছে ডাকিয়া, নিয়মিত ভাবে মেজরের সেবাযত্ন করিবার জন্য বৃদ্ধ বার বার বলিয়া দিয়াছিল। কিন্তু বালক ভগ্‌লু আজমগড়ে আসিয়া প্রাণপণ চেষ্টাতেও কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। শিউকিষণের উপদেশ মত প্রভুর সেবাযত্নের ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে—পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত গাজু ও বাবুর্চ্চির আসন ঠেলিয়া —সে কোনমতেই নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল না। বিশেষতঃ প্রভু যখন তাহার শত অভিযোগ-অনুযোগেও কর্ণপাত করিলেন না, তখন বেচারা ভগ্‌লুকে বাধ্য হইয়া বাবুর্চ্চি ও গাজুর হাতেই আত্মসমর্পণ করিতে হইল। গাজুর ব্যবস্থামতই মেজরের সাংসারিক গতিবিধি পরিচালিত হইতেছিল।

মেজরের ব্যাপার লইয়া বেয়ারা ও বাবুর্চ্চি কেহই ব্যস্ত হইত না; তাহারা প্রভুর বর্ত্তমান অবস্থা সম্পূর্ণরূপেই বুঝিয়া লইয়াছিল। মেজরও কোন বিষয়ে কখনো আপত্তি করিতেন না। ক্রমে ক্রমে মেজরের ক্যাশের চাবি পর্য্যন্ত গাজুর হাতেই আসিয়া পড়িল। আর গাজুও সেই সুবর্ণ-সুযোগটুকুকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইদানীং মেজরের সুরাপানের মাত্রাও যেরূপ ক্রমে গ্লাস হইতে বোতলের সংখ্যা বাড়াইয়া চলিতেছিল, ব্যয়ের মাত্রাও ঠিক

তদনুরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেনারসে থাকিতে—শেষের দিকে—মেজরের বেতনের টাকায় আর মাস চলিত না, তবুও শিউকিষণ্ বহু চেষ্টায় তাহাতে প্রায় তিন সপ্তাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। মেজর তখন হইতেই তাঁহার পিতার আমলের এটর্ণি ননীলাল মল্লিকের নিকট পত্র লিখিয়া মাসে মাসে ঋণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আজমগড়ে আসিয়া তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শিউকিষণের হাতে যে অর্থে তিন সপ্তাহ চলিত, গাজুর হাতে পড়িয়া তাহা প্রায় প্রথম সপ্তাহেই শেষ হইয়া যাইতেছিল। অবশ্য মেজরের অপব্যয় বেনারসের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হইয়া পড়িয়াছিল। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত—যতক্ষণ মেজর জাগিয়া থাকিতেন, ততক্ষণ আর তাঁহার মদ্যপানের বিরাম থাকিত না।

সেদিন হুইস্কি আনিতে গিয়া গাজু প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যেও বাজার হইতে ফিরিল না দেখিয়া মেজর যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার বিরক্তি রাগে পরিণত হইতে লাগিল। এই কয়েক মাসের অবিশ্রান্ত সুরাপান মেজরকে এতই আসক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, দুই ঘণ্টাকাল বিরত থাকাও তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, বয়কে তখনই গাজুর উদ্দেশে পাঠাইয়া দিলেন। মেজরের মেজাজ তখন এতই রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল যে, বালক ভৃত্য ভগ্‌লুও তাঁহার কয়েকটী কথার মধ্যে তাহা ভালভাবেই উপলব্ধি করিল।

ভগ্‌লুকে পাঠাইয়া দিয়া মেজর ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন। অবসরের এক একটী মুহূর্ত্ত যেন তাঁহার নিকট এক

একটী যুগ বলিয়া মনে হইতেছিল। কপাল কুঞ্চিত করিয়া, দুই হাতে জোরে জোরে মাথার চুলগুলি টানিতে টানিতে মেজর হল্‌ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিলেন। গাজুর বিলম্ব করিবার কথা ভাবিতে গিয়া তাঁহার মনে হইল—বোধ হয় চাকরেরাও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে সুরু করিয়াছে। নহিলে তাঁহারই বেয়ারার এতদূর স্পর্দ্ধা যে··· ।

হঠাৎ কি ভাবিয়া মেজর জানালার পাশে আসিয়া কোচটার উপর বসিয়া পড়িলেন। সহসা যেন একটা বিজাতীয় ক্রোধে তাঁহার বুকের ভিতর জ্বালা করিয়া উঠিল। উঃ, সেই অনি! যাহার জন্য তিনি অনেক কিছু করিয়াছেন, সে কি না তাঁহাকে পথের ধূলার মত পদদলিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে! তাঁহার সব শক্তি, শান্তি ও তেজকে চাকর বাবুর্চ্চির নিকটেও আজ এত হেয় করিয়া তুলিয়াছে! এমন কি কারণ ঘটিয়াছিল, যাহা লইয়া অনি তাঁহার উপর এত বড় একটা প্রতিশোধ লইয়া গিয়াছে?

মেজর পুনরায় হল্‌ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারি করিতে লাগিলেন। আজমগড় কোয়ার্টারের হল্‌ঘরখানি খুব প্রশস্ত ছিল; তাঁহার লাইব্রেরীর আলমারিগুলি হলের এক পাশে, দেয়ালের কোলে কোলে, সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। আপন মনে ঘুরিতে ঘুরিতে মেজর একটা আলমারির সম্মুখে আসিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; ক্ষণেক কি ভাবিয়া, সেটাকে টানিয়া খুলিয়া ফেলিলেন। থাকে থাকে রাশীকৃত বই অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ভাবে খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। ইংরাজী, বাংলা, ডাক্তারি—জাতি-নির্ব্বিশেষে কে কাহার পার্শ্বে স্থান

পাইয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। সব বিশ্রী ও বিশৃঙ্খল। এ কাজ ভগ্‌লুর। বেনারস হইতে জিনিষপত্র আজম্‌গড়ে লইয়া আসার পর ভগ্‌লুই প্রাণপাত চেষ্টায় সেগুলি যথাসাধ্য গুছাইয়া রাখিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছে। অশিক্ষিত বালক বইগুলিকে সাজাইয়াছে—শুধু তাহাদের বাহিরের রং ও আকার মিলাইয়া। বিষয় ও ভাষা মিলাইয়া সাজাইবার শক্তি সে বেচারী কোথায় পাইবে!

মেজর ক্ষিপ্রহস্তে বইগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে উপরের থাক্ হইতে একখানা মোটা বই টানিয়া লইয়া, তাহার পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিলেন। সেখানি 'মনোবিজ্ঞান'। বইখানি মেজরের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। পূর্ব্বে, অবসর সময়ে মনস্তত্ত্বের সেই বইখানি লইয়া তিনি প্রায় তন্ময় থাকিতেন। উপন্যাস ও বাজে বই পড়িবার সখ তাঁহার খুব কমই ছিল।

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সহসা মেজরের চোখে পড়িল—একখানি লম্বা কাগজ—ভাঁজ করিয়া বইএর মধ্যে গোঁজা। অনির হাতের লেখা দেখিয়া বোধহয় মেজরের সেই অন্যমনস্কতার মধ্যেও একটু কৌতূহল হইল; তিনি কাগজখানি খুলিয়া ফেলিলেন। অনির হাতের লেখা তাঁহারই আয়-ব্যয়ের একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব; আরও কয়েকটী কথা—! হঠাৎ মেজরের মাথার মধ্যে আবার চন্‌চন্ করিয়া রাগ উঠিয়া পড়িল, ঠিক চিতি সাপের বিষের মত। ওষ্ঠ দংশন করিয়া মেজর কাগজসহ বইখানিকে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন; শক্ত বাঁধানো বই সজোরে আল্‌মারির কাঁচে গিয়া লাগিতেই তাহা ঝন্‌ঝন্ করিয়া ভাঙিয়া পড়িল। তৈল-

হীন কলকজার ভিতর যেমন পরস্পরের সংঘর্ষণে একটা বিশ্রী বিকৃত শব্দ হয়, মেজরের ভিতর হইতেও যেন ঠিক তেমনি একটা বিকৃত শব্দ বাহির হইয়া আসিল—"কোনও দরকার ছিল না। নিছক ভণ্ডামী।"

*　　*　　*　　*　　*

বাজারে যাইতে যাইতে গাজু দেখিল স্কুলের পাশের ময়দানটায় ভীষণ ভিড় জমিয়াছে। স্থানীয় বহু ভদ্রলোক, কুলি-মজুর, ও ছাত্র সেখানে সমবেত হইয়াছেন। কৌতূহলী হইয়া গাজুও একবার ব্যাপারটা জানিয়া লইবার জন্য ভিড়িয়া পড়িল।

খদ্দর-পরা একজন দীর্ঘকায় বাঙ্গালী যুবক ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে অনর্গল কি বলিয়া যাইতেছিলেন। অতি সাধারণ পোষাক পরিয়া থাকিলেও, তাঁহার চেহারা ও বক্তৃতার মধ্যে এমন তেজস্বিতা ফুটিয়া উঠিতেছিল, যাহাতে গাজুর মত লোকের মনটাও ক্ষণেকের জন্য আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। বিশেষ মনোযোগ সহকারে গাজু তাঁহার বক্তৃতা একটু শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; সে বুঝিল —তিনি তাহাদেরই কথা বলিতেছেন।

দেশের অশিক্ষিত দরিদ্র সম্প্রদায়কে কেমন করিয়া উন্নত করিতে হইবে; মানুষ হিসাবে তাহাদের কতখানি অধিকার আছে; শিক্ষিত সমাজের সে সম্বন্ধে কি করা উচিত, কতখানি দায়িত্ব—ইত্যাদি নানা কথা তিনি আন্তরিক দরদের সঙ্গে বলিয়া যাইতেছিলেন। সমবেত জনসঙ্ঘ তাঁহার বক্তৃতায় ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। তিনি এমন মর্ম্মস্পর্শীভাবে অনুন্নত সমাজের করুণ কাহিনী তাহাদের নিকট বলিয়া গেলেন যে,

গাজু খান্‌সামার চোখেও তাহাতে জল আসিতেছিল। নিজেদের কথা ভাবিয়া আজ তাহার মনেও অনেক সঙ্কল্প আসিয়া পড়িতেছিল।

তারপর তিনি য়ুরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান—নানাদেশের সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা কেমন করিয়া দেশকে উন্নত করিয়াছেন ; আর আমাদের দেশের অনাথ অসহায়েরা কেমন করিয়া সহানুভূতি ও আশ্রয়ের অভাবে ধ্বংস হইতেছে ; কেমন করিয়া তাহাদের জীবন ব্যর্থ হইতেছে ; ইহা-দিগকে কি উপায়ে মানুষ করিয়া তোলা যায় !

অবশেষে পল্লী-সংস্কার, কুটীর-শিল্প, নৈশ-বিদ্যালয় ও অনাথ-আশ্রম সম্বন্ধে কয়েকটি আবেদন জানাইয়া তিনি বক্তব্য শেষ করিলেন। উচ্চ জয়-ধ্বনির সঙ্গে সভা যখন ভঙ্গ হইল, তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে।

গাজু তন্ময় হইয়া এতক্ষণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেছিল। তাহার মনে তখন এমন একটা পরিবর্ত্তনের হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, মুনিবের হুকুমের কথা তাহার আর খেয়াল ছিল না। সভা ভাঙিতেই গাজুর মনে পড়িল—সে সাহেবের জরুরী কাজে আসিয়াছে। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের পানে চাহিয়া তাহার বুকের ভিতরটা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলিয়া সে বাজারের দিকে ছুটিয়া চলিল। গাজু স্পষ্টই বুঝিতে-ছিল, আজ তাহার উপর দিয়া কত বড় ঝড় বহিবে।

* * * *

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিতান্ত অন্যমনস্ক হইয়া মেজর তখনো শোফার উপর অর্দ্ধশায়িতভাবে পড়িয়া ছিলেন। গাজু অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে গেল। আশঙ্কায় তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা পর্য্যন্ত তখন কাঠ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মেজর তখন এতো অন্যমনস্ক হইয়া ছিলেন যে, গাজুর আগমন তিনি বুঝিতেও পারিলেন না। গাজু টীপয়টা টানিয়া আনিয়া ডিক্যাণ্টার ও গ্লাস মেজরের সম্মুখে সাজাইয়া দিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—"হুজুর, সরাব।"

মেজর কোনো কথা বলিলেন না। একবারমাত্র বেয়ারার দিকে চাহিয়া, হাত বাড়াইয়া এক গ্লাস মদ ঢালিয়া লইলেন। তাঁহার দৃষ্টির ভিতর দিয়া যেন তখন আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল।

গাজু একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। চাকরী আজকার মত রক্ষা হইল। সে চুপি চুপি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল; দরজার সম্মুখ পর্য্যন্ত আসিয়াই সহসা চমকিয়া উঠিয়া দেখিল—সভার সেই ভদ্রলোক কয়টী। গাজু সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। তাঁহারা মেজরের নিকট অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিলেন।

সকলের মাথায় গান্ধী টুপি দেখিয়াই, মেজর বুঝিলেন তাঁহারা কে। প্রতিনমস্কার করিয়া, তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কি চান্?"

"অনাথ-আশ্রম ও নৈশ-বিদ্যালয়ের জন্য কিছু সাহায্য।"

মেজর একটা বিকৃত হাসি হাসিলেন; উত্তর না দিয়া পুনরায় এক গ্লাস মদ ঢালিলেন।

প্রধান কর্ম্মী ঈষৎ অগ্রসর হইয়া অনুনয়ের সহিত বলিলেন—“আপনাকে আর একটি অনুরোধ রাখ্‌তে হবে। আমাদের অনুরোধ ব’লেই শুধু নয়, দেশের ও দশের অনুরোধে, আপনার অনাহারক্লিষ্ট ভাইবোনদের মুখ পানে চেয়ে, আপনাকে সুরাপান ত্যাগ ক’রতে হবে। আপনি উচ্চশিক্ষিত—আপনার কাছ থেকে আমরা দেশের উদ্দেশ্যে এই ত্যাগটুকু খুবই আশা করি। সাহায্য করুন না-করুন, এ ভিক্ষাটি দিতেই হবে।”

মেজর পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্কভাবেই উত্তর করিলেন—“হবে না। কা’ল সকালে আস্‌বেন।”

“আপনি একটু চেষ্টা ক’র্‌লেই হবে। আপনার মত লোকের কাছ থেকে এ ত্যাগটুকু আমরা খুবই আশা করি। এ সম্বন্ধে কোন কথা আপনাকে বোঝাতে যাওয়া আমাদের ধৃষ্টতা। এর ভিতর দিয়ে আমাদের অর্থ ও সামর্থ্য—দু-ই লোপ পাচ্ছে। আপনি যদি দয়া ক’রে নিজের এই সামান্য অপব্যয়টুকু অনাথ-অসহায়দের জন্যে ত্যাগ করেন, তা হ’লে তাই দিয়ে একটা মহৎ কাজ হ’তে পারে। এই যেমন—

মেজরের যেন এতক্ষণে খেয়াল হইল। তিনি কর্ম্মীদের এই বক্তৃতায় অকারণ তাতিয়া উঠিয়া বলিলেন—“নন্‌-কো-অপারেশন্‌! গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন! হিঁয়াপর নেই হোগা। আভি নিকালো—”

হঠাৎ একটা বিকট প্রেতমূর্ত্তি দেখিলে মানুষ যেমন শিহরিয়া উঠে, মেজরও সেইরূপ আচম্বিতে ভগ্‌লুর পশ্চাতে অনি ও বনবিহারীবাবুকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার কথা মুখের মধ্যেই থামিয়া গেল।

ধীর ও দৃঢ়পদে অনি মেজরের টেবিলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার চেহারার ভিতর তখন এমন দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, মেজরও বোধ হয় তাহা দেখিয়া ভয় পাইলেন। অনি কোনো কথা না বলিয়া টেবিলের উপর হইতে মদের বোতলটা লইয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল। মেজর একবার মাত্র অনির মুখপানে চাহিয়াই হাতে মুখ ঢাকিয়া কৌচের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। অর্দ্ধ সমাপ্ত পেগটা তাঁহার হস্তস্খলিত হইয়া সশব্দে পড়িয়া গেল।

ভদ্রলোকেরা নির্ব্বাক্-ভাবে দাঁড়াইয়া এই মহীয়সী নারীর পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

সহসা পশ্চাৎ ফিরিয়া অনি তাঁহাদিগকে তখনো তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইয়া গেল। মেজরের সেই রূঢ় ভাষা অনির কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। ভদ্রসন্তানের প্রতি যে মেজর ঐরূপ অমানুষিক ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

ঈষৎ অগ্রসর হইয়াই অনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ কি! এ যেন তাহার খুব চেনা মুখ! কিন্তু অনি ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যেন বহুদিন পূর্ব্বের একটা স্বপ্নের ছবির মত অনির স্মৃতিতে অতি ক্ষীণভাবে তাহা জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহার স্মৃতি ও দৃষ্টিকে প্রাণপণ শক্তিতে তীক্ষ্ণ ও প্রসারিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়াই অনি বিহ্বলভাবে বলিয়া উঠিল—"নিরঞ্জন-দা! আপনি—নিরঞ্জন-দা! এখানে?"

তিনি যেন আরও বেশী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—
“হ্যাঁ ; তুমি—তুমি—অনু !”

অনির বুক ঠেলিয়া সহসা কান্না আসিবার উপক্রম হইল। জীবনের কত স্মৃতি—কত কথা ! নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া সে বলিল—“আশা ক’র্‌তে পারি নি দাদা, যে জীবনে আর কখনো দেখা হবে। আপনার কথা অনেকবার ভেবেছি ; কিন্তু কোন খোঁজই পাইনি।”

“আমার মত যাযাবরের খোঁজখবর পাওয়া সত্যি কঠিন। আগে কোলকাতায় ছিলুম। শরীর ও মন ভাল না থাকায় মাঝে প্রায় বৎসর দুই শিলং পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলুম : তারপর কাজে অকাজে কিছুদিন ভবঘুরের মত দেশে দেশে বেড়িয়ে, শেষে এই মাস দুই হ’ল বেনারস হিন্দু য়ুনিভার্সিটির প্রোফেসারি নিয়ে এসেছি।

কিন্তু দিদি, তুই এতো বদ্‌লে গেছিস্ যে—তোকে আর দেখে চেনা যায় না। বেনারসে এসেই সর্ব্বপ্রথমে তোদের বাসার খোঁজ নিতে গেছলুম, কিন্তু সেখানে দেখি—এখন এক হিন্দুস্থানী বাস ক’র্‌ছে।”

নিরঞ্জনের কথায় ঈষৎ হাসিয়া অনি বলিল—“জীবনের সে অধ্যায়েও যবনিকা পড়ে’ গেছে দাদা।”

অনির সে হাসি যেন বিকৃত ওষ্ঠের একটা আকারান্তর মাত্র।

“আর বদ্‌লে যাওয়ার কথা বল্‌তে গেলে, কেবল আমি একাই বদ্‌লাই নি দাদা ; আপনিও বদ্‌লে’ গেছেন ঢের। আপনাকে দেখেছিলুম—‘অসাধারণ তেজস্বী’ ; কিন্তু আজ যে রকম ভাবে নির্ব্বিবাদে অপমানটা আপনি হজম ক’র্‌ছিলেন,

তাই দেখে আমার সন্দেহ হ'চ্ছিল আরো বেশী, যে—আপনি সেই 'নিরঞ্জন-দা' কি না!"

"আমাদের জীবনের যে এই ব্রত দিদি। এ যে বৈষ্ণবের দেশ ভাই। এরা রাগকে জয় ক'রেছে ক্ষমা দিয়ে, হিংসাকে জয় ক'রেছে প্রেম দিয়ে। সহিষ্ণুতা দিয়ে চিরদিন এরা অসহ্যকে জয় করে' এসেছে। চৈতন্যদেবের সেই কলসী-কাণার আঘাত তোমার মনে নেই? যাক্, কিন্তু তুমি যে হঠাৎ এখানে দিদি? ডাক্তারবাবু কি তোমার আত্মীয়?"

অনি মাটির দিকে চোখ নামাইয়া, একটা ঢোক গিলিয়াই তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল—"হাঁ"।

প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করিয়া লইবার জন্য মেজর দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া রাখিলেও, তাঁহার বুক ঠেলিয়া একটা চাপা কান্নার অস্পষ্ট শব্দ বাহির হইয়া আসিতেছিল।

পরদিন সকালে অনি চাকরদিগকে লইয়া সমস্ত ঘর-বাহির পরিষ্কার করিল। লাইব্রেরীর বিশৃঙ্খল বইগুলি, স্তূপীকৃত সাময়িকপত্রিকা সকল ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অবস্থা দেখিয়া তাহার কান্না পাইতেছিল। এই কয় মাসের মধ্যে মেজরের যত চিঠি-পত্র আসিয়াছে, তাহার অধিকাংশই তদবস্থায় টেবিলের উপর পড়িয়া আছে; মেজর সেগুলিকে খুলিয়া পড়িবার অবসর পর্য্যন্ত পান নাই। অনি বাছিয়া বাছিয়া কয়েকখানি পত্র খুলিয়া ফেলিল; বিশেষ করিয়া রেজিষ্টার্ড পত্রগুলি। মহাজন ননীলাল মল্লিক, প্রাপ্য টাকার দলিল কিম্বা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন, অথচ মেজর সে পত্রগুলি যে অবস্থায় আসিয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখিয়াছেন। পত্রগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে সহসা একটা সংশয়ের দোলায় তাহার মনটা একবার চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু সংযত-চিত্তা অনির মনে তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। এটর্ণির সেই সমস্ত চিঠি একত্র করিয়া অনি ভগ্‌লুকে দিয়া মেজরের নিকট পাঠাইয়া দিল। এখানে আসা অবধি সে মেজরের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংস্কারে এতো গভীর ভাবে মনঃসংযোগ করিয়াছিল যে, তখনো পর্য্যন্ত মেজরের সহিত তাহার কোনো কথাবার্ত্তা বলিবার সুযোগ হয় নাই। কিম্বা অনি হয়তো ইচ্ছা করিয়াই তাহা এড়াইয়া চলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। মেজরও পূর্ব্বের ন্যায় কোনো সময়ের জন্যই .অনির সম্মুখীন হন নাই। অনির সুনিপুণ হস্ত-স্পর্শে সেই বিশৃঙ্খল গৃহের শ্রী ফিরিয়া আসিল। মেজরের মদ্যপানের সাজ-সরঞ্জামগুলি অনি স্বহস্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া

ফেলিল। বেয়ারা ও বাবুর্চ্চি কেহই তাহার কার্য্যে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

বিকালে গাজুর নিকট হইতে অনি টাকাকড়ির সমস্ত হিসাব বুঝিয়া লইল। লেখা-পড়া না জানার অছিলায় বেয়ারা সকল বিষয়ের সঠিক হিসাব ও কৈফিয়ৎ দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেও, বর্ত্তমান খরচের ভিতরের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে অনির কিছুমাত্র বাকী রহিল না। মাসের চার দিন না যাইতেই বেতনের টাকা প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হইয়া গিয়াছে! গাজুর নিকট হইতে চাবি চাহিয়া লইয়া অনি টাকাকড়ি সমস্তই মেজরের দেরাজের মধ্যে রাখিয়া তালা বন্ধ করিয়া দিল; ও খরচ সম্বন্ধে গাজুকে বার বার সাবধান করিয়া বলিয়া দিল—যে, সে যেন প্রয়োজন মত পয়সা সাহেবের নিকট চাহিয়া লয়!

* * * *

অনির অনুরোধ মত, সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেই নিরঞ্জনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা জীবনের এত বড় একটা কর্ম্মক্ষেত্রে নিরঞ্জন-দাকে পাইয়া অনি যেন মনে মনে অনেকখানি সবল হইয়া উঠিয়াছিল। বিপর্য্যয়ের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া সে বহুদিন হইতেই এই নিরঞ্জন-দার ন্যায় উদার ও সহৃদয় হিতৈষী বন্ধুকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।

নিরঞ্জনবাবু আসিতেই, অনি তাঁহাকে দেখাইয়া গাজুকে পুনরায় বলিয়া দিল—"সপ্তাহে সপ্তাহে টাকাকড়ির সব হিসেব এই বাবুর কাছে দেবে; বুঝলে?" নিরঞ্জনবাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া অনি জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা এখন কিছুদিন আজমগড়েই র'য়েছেন বোধ হয়?"

“হাঁ, অন্ততঃ এখানকার কাজ-কর্ম্ম যতদিন শেষ না হ’চ্ছে। য়ুনিভার্সিটিও এখন বন্ধ।”

* * * *

নিরঞ্জন-দা'কে সঙ্গে লইয়া অনি বাগানের মধ্যে গিয়া বসিল। জীবনের অনেক স্মৃতি ও অনেক কথা তাহার বুকের তলায় জমা হইয়া উঠিয়াছিল। নিরঞ্জন-দা তাহাদিগকে কাশীতে রাখিয়া যাইবার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, অনি সংক্ষেপে সমস্তই বলিল। মায়ের মৃত্যু, দাদুর শেষ, মেজরের সাহায্য ও সহানুভূতি —কোনো কথাই অনি তাঁহাকে জানাইতে বাকী রাখিল না। কেবল মাত্র মেজরের সেই দুর্ব্বলতার কথা সে প্রকাশ করিতে পারিল না; সে নারী, নিজের উপর দিয়াই যে বিপ্লব অত হীনভাবে ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে তাহার অন্তর লজ্জা ও ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

মেজরের সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া নিরঞ্জনের হৃদয় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিতেছিল। এত মহৎ, এত সহৃদয় ডাক্তার সাহেব! অথচ তিনি মাতাল! গত সন্ধ্যায় তাহাদের সহিত যে ব্যবহার তিনি করিয়াছেন, তাহাতে মনুষ্যত্বের গন্ধও পাওয়া যায় না। শেষের কথাগুলি ভাবিতে গিয়া যেন নিরঞ্জনের মনে কেমন একটা ধাঁধা লাগিতেছিল। একটু সঙ্কোচের সহিত তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“ডাক্তারবাবু কি আগেও মদ খেতেন অনু?”

“না; অন্ততঃ আমি যতদিন বেনারসে ছিলুম, ততদিন তাঁকে ও-রকম কোনো নেশাই ক’রতে দেখিনি। এক চুরুট-সিগারেট

ছাড়া তিনি কোনো নেশারই বশীভূত ছিলেন না। তবে—" কি বলিতে গিয়া অনি সহসা থামিয়া গেল। ক্ষণেক কি ভাবিয়া লইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল—"আচ্ছা দাদা, এই আব্‌গারির দোকানগুলোকে দেশ থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন না?"

অনির কথায় নিরঞ্জনবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। সস্নেহে অনির মুখপানে চাহিয়া বলিলেন—"গায়ের জো'র কি সব জায়গায় চলে দিদি? সে কথা এখন থাক্; আচ্ছা অনু, তুমি কি এখন বেনারস ছেড়ে চলে গেছ? সেই জন্যেই বোধ হয় তোমাদের সেই পুরোনো পল্লীর কেউ তোমার খবর দিতে পার্‌লে না। কিন্তু বেনারস ছেড়ে গিয়ে তুমি আছ কোথায়? তোমাদের আর কোনো আত্মীয়স্বজন ছিলেন ব'লে তো আমার মনে হয় না। তোমার এক পিসিমা ছিলেন বটে শুনেছিলুম, কোল্‌কাতায়।"

"পিসিমা এখনো কো'লকাতাতেই আছেন; কিন্তু তাঁর কথা আর ব'লে কাজ নেই দাদা, এখন আর তিনি স পিসিমা নন্; কাছে রাখা তো দূরের কথা, আমায় দেখে তিনি চিন্‌তে পর্য্যন্ত পার্‌লেন না। তাই নিজের মান-সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্যে আর তাঁর ওখানে উঠিনি, যদিও গোড়ায় সে ইচ্ছা ছিল। মানুষ যখন নিতান্ত বিপন্ন হ'য়ে পড়ে, তখন পিসিমা কেন, কোনো সমৃদ্ধ আত্মীয়ই তাকে চিন্‌তে পারে না। জীবনের উপর দিয়ে যে ঝড়গুলো একে একে ব'য়ে গেছে, তাতে আত্মীয়স্বজন কারও সাড়া পাই নি। একমাত্র বন্ধুবান্ধবেরাই সব করে'ছেন। দাদুও যে দিন আমায় একা ফেলে চলে গেলেন, সেদিন অত্যন্ত অসহায় হ'য়ে পড়েছিলুম। দাদু মেজরকে অনুরোধ ক'রেছিলেন, যতদিন আমি নিজেকে চালিয়ে নেবার মত কোনো একটা ব্যবস্থা ক'র্‌তে

না পারি, ততদিন যেন তিনি দয়া ক'রে একটু আশ্রয় দেন! দাদুর সে অনুরোধ তিনি যথাসাধ্য রক্ষা ক'রেছিলেন। তারপর এই বনবিহারী-দা আর মঞ্জিষ্ঠাদি, এঁরা যথেষ্ট ক'রেছেন। জীবনের সেই ভীষণ ঘূর্ণিতে পড়ে' যদি এঁদের মত উদার ও মহৎ বন্ধুর আশ্রয় না পেতুম, তা'হলে অবস্থার শেষ পরিণতি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো তা ভাবতেও পারি না। মঞ্জিষ্ঠা-দি আমার জন্যে যথেষ্ট ক'রেছেন ; তাঁর সহানুভূতি পেয়েছিলুম ব'লেই আজ কোনো রকমে দাঁড়াতে পেরেছি। তিনিই শ্যামবাজারে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আমায় গৃহ-শিক্ষয়িত্রী ক'রে দিয়েছেন। ছোট্ট একটী মেয়েকে পড়াতে হয়। সুরথবাবু ও তাঁর স্ত্রী নীলিমাও লোক খুব ভালো—"

অনি হঠাৎ নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া দেখিল যে, তিনি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছেন ; তাহার কথা একটীও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে কি না সন্দেহ।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া অনি বলিল—"চলুন দাদা, সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে ; আটটা দশ মিনিটে ট্রেন,—আজ রাত্রের ট্রেনেই ফিরতে হবে ; বনবিহারী-দা'রও ছুটি নেই, আমারও থাকবার উপায় নেই—কেন না—"

অনির কথা শেষ না হইতেই নিরঞ্জন পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্ক ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"তোমার মঞ্জিষ্ঠা-দি কি করেন অনি ?"

"দেশের কাজ"।

অনি বুঝিল—নিরঞ্জন-দা এখনো তন্ময় হইয়া কি যেন ভাবিতেছেন। সে তাঁহার গায়ে হাত দিয়া ঈষৎ নাড়া দিয়া ডাকিল "দাদা!—"

"হাঁ, চলো যাই" বলিয়াই নিরঞ্জন উঠিয়া পড়িলেন। অনি তাঁহার এই আকস্মিক অন্তমনস্কতার কোনো কারণই খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে নিরঞ্জন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি নীলিমার মেয়েকে পড়াও, না উর্ম্মিলার মেয়ে কণাকে—? নীলিমার তো কোনো—"

"আপনি কি তাঁদের চেনেন?" অনি একটু আশ্চর্য্য হইয়াই নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিল। অন্ধকারে চোখ মুখের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য করিতে না পারিলেও, তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, নিরঞ্জন-দা মঞ্জিষ্ঠাদি'দের কথায় খুব আনমনা হইয়া গিয়াছেন।

* * * *

সেইদিন ৮—১০ মিঃ ট্রেনেই অনি ও বনবিহারীবাবু আজম্‌গড় ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। আজম্‌গড়ে আসিয়া অনি যে চব্বিশ ঘণ্টা ছিল, তাহার মধ্যে মেজরের সহিত কোনো সময়ের জন্যই তাহার কথাবার্ত্তা হইল না। মেজর ও অনি উভয়েই যেন ইচ্ছা করিয়া পরস্পরকে এড়াইয়া চলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। বিদায়-বেলায় অনি একবার মেজরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; তাহার মনটা হয়তো তখন অনেক কথা বলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অনি কোনো দিকে না চাহিয়া মেজরের পায়ে মাথা রাখিয়া একটী প্রণাম করিয়া কেবলমাত্র বলিল—"চল্‌লুম! চোরের ওপর রাগ ক'রে ভুঁয়ে ভাত খাবেন না!"

মেজরের মুখে সহসা কোনো উত্তর যোগাইল না। অনির পানে মুখ তুলিয়া চাহিতেও যেন লজ্জায় তাঁহার মাথা নত হইয়া পড়িতেছিল। অনিও কোনো উত্তরের আশা না করিয়াই তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

উদ্গত অশ্রুকে দমন করিবার জন্য মেজর ওষ্ঠ দংশন করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

* * * *

নিরঞ্জনবাবু অনি ও বনবিহারীবাবুর সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিলেন। অনি অনেকবার লক্ষ্য করিল যে নিরঞ্জন-দা যেন কি একটা কথা বলি’-বলি’ করিয়াও বলিতে পারিতেছেন না। অনি গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“দাদা, আপনি কি কিছু ব’ল্‌বেন ?”

নিরঞ্জন একটু বিস্ময়ের সহিত অনির মুখপানে চাহিলেন। “না, এমন বিশেষ কিছু নয়। মঞ্জুকে আমার কথা ব’লো। আর তাকে জানিও যে, কাজকর্ম্ম এখানে ভালই চ’ল্‌ছে ; প্রোফেসর চৌধুরী আজো জীবনের ব্রত ত্যাগ করেনি।”

নিরঞ্জন আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তার পর হঠাৎ কি ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—“তুমি যে বড় শীগ্‌গির ফিরে যাচ্ছো অনি ? বেনারসে নেমে যাবে না ?”

“না দাদা ; সুরথবাবুরা কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাবেন ঠিক ক’রেছেন, আমাকেও তাঁদের সঙ্গে যেতে হবে। বোধ হয় দু’এক দিনের মধ্যেই আমরা পুরী যাবো।”

"তোমরা সকলেই যাবে?" এই 'সকলেই' কথাটার উপর এমন একটা অস্বাভাবিক রকমের জোর পড়িল যে, নিরঞ্জন-দা নিজেই তাহা লক্ষ্য করিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িলেন; অথচ অনি ও বনবিহারীবাবুর তাহাতে মনে করিবার কিছুই ছিল না।

গাড়ী ছাড়িয়া দিতেই নিরঞ্জন-দা অনি ও বনবিহারীবাবুর নিকট বিদায় লইয়া প্ল্যাটফর্মে নামিয়া দাঁড়াইলেন। মেজরের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য অনি তাঁহাকে বার বার বিশেষভাবে অনুরোধ করিল। এ অনুরোধের ভিতর দিয়া অনির সমস্ত আন্তরিকতা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল; আজ আর তাহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না।

সেবারে বেনারস ছাড়িয়া যাইবার সময় অনির মনটা যেরূপ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, এবার আজমগড় ছাড়িয়া যাইতে যেন তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। বনবিহারীবাবুর পত্র পাইয়া অনি যেদিন কলিকাতা হইতে ছুটিয়া আসে, সেদিন সে মনে মনে অনেক কিছুই আঁকিয়াছিল ; কিন্তু মেজরের সম্মুখে আসিয়া তাহার সেই কল্পনার রেখাগুলি সব অস্পষ্ট হইয়া গেল। প্রথমটা, মেজরের ঘরের মধ্যে গিয়া অনি তাঁহার সুরাপানের সরঞ্জামগুলিকে হাতের কাছ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিল—একটা আবেগভরে ; কিন্তু, কিয়ৎক্ষণ পরেই—তাহার সেই আবেগ যখন প্রশমিত হইয়া আসিল, অনির হৃৎপিণ্ডের ভিতর এমন একটা দুর্ব্বলতা ধুক্‌ধুক্ করিয়া উঠিল যে, সে আর কোনো প্রসঙ্গ লইয়াই মেজরের সঙ্গে আলাপ করিতে পারিল না। নিজের উপরেও বোধহয় অনির বিশ্বাস অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল।

অনি যতক্ষণ আজমগড়ে ছিল, ততক্ষণ নিজের প্রকৃত অবস্থাটুকু সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। নিরঞ্জনের নিকট বিদায় লইবার সময় পর্য্যন্ত সে বেশ সবল ছিল,—অন্ততঃ জোর করিয়াও নিজেকে সামলাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ট্রেন্ যখন আজমগড়ের সীমানা ছাড়াইয়া, অন্ধকার মাঠের নিস্তব্ধ বুকের উপর আসিয়া নামিল, অনির বুকের ভিতর জীর্ণ ব্যথাগুলি সব চলন্ত ট্রেনের মতই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ছুটিয়া আসিল।

নিরঞ্জনদার উপর মেজরের ভার দিয়া অনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কিন্তু মেজরের সঙ্গে আজ সারাটা দিন সে

যে-ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, আপন-মনে তাহার আগাগোড়া ভাবিয়া দেখিতে গিয়া অনি অস্থির হইয়া পড়িল। একবার অতি সামান্য একটা আঘাত করিয়া সে মেজরকে যেখানে ঠেলিয়া দিয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণই হয়তো সারা জীবনে করিতে পারিবে না; তার উপর আজ আবার নূতন করিয়া সে ইন্ধন যোগাইয়া আসিল—মেজরের সঙ্গে কোনো কথা না বলিয়া। ডাক্তার যে ভুল একদিন করিয়াছিলেন, অনির মন হইতে তাহার দাগ তো এখন নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। মেজরের উপর তার বিন্দুমাত্র অভিমান নাই। তবু অনি যে আজ তাঁহার সম্মুখে পূর্ব্বের মত তেমনি সরলভাবে দাঁড়াইতে পারে নাই কেন, তাহা কে বুঝিবে? মেজরের জীবনের এই বিপর্য্যয় দেখিয়া অনির সারা প্রাণ আত্মগ্লানিতে ভরিয়া গিয়াছে। —কিন্তু, মেজর যদি আবার তাহার এই মৌনতাটুকুকে ভুল বুঝিয়া থাকেন! তিনি যে অত্যন্ত অভিমানী; নিজের আগুনে নিজেকেই পোড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিবেন। অনি চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতেছিল—সে ফিরিয়া গিয়া মেজরের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া আসে।

"অনু, বিছানাটা পেতে নিয়ে—তুমি বরং একটু শুয়ে' পড়। তা নইলে, এই লং জার্নিতে বড্ড বেশী ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়্বে।"

অনি এতো অন্যমনস্ক হইয়াছিল যে, বনবিহারীবাবুর কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া তেমনি ভাবেই অনি বসিয়া রহিল। বনবিহারীবাবু তাহার অবস্থা দেখিয়া বেশ স্পষ্টই বুঝিলেন যে, একটা গুরুভার দুশ্চিন্তা তাহাকে বিমনা করিয়া রাখিয়াছে।

............ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া, বনবিহারীবাবু অনিকে একটু আন-মনা করিবার উদ্দেশ্যে আবার বলিলেন—"অনি, তুমি কি এই গাড়ীতেই বরাবর কোল্‌কাতা ফির্‌বে ভেবেছ? তা কিন্তু হবেনা। "সু" তা হ'লে আমার উপর রেগে আগুন হ'য়ে যাবে, দশদিন হয়তো ভাল ক'রে কথাই ব'ল্‌বে না।"

এবার ডাক শুনিয়া আচম্বিতে যেন অনির সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। নিজের পূর্ব্ব-অবস্থাটুকু বনবিহারীবাবুর নিকট গোপন করিবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"না দাদা, কোনো-রকমেই সে হবার জো নেই। নইলে, সে কথা আমায় ব'ল্‌তে হ'ত না। লতির আকর্ষণটা আমিও কম অনুভব করি না।"

অনির মনটাকে আরো একটু তরল করিয়া দিবার চেষ্টায় বনবিহারীবাবু উচ্চ হাসিয়া বলিলেন—"দেখা যাক; এই মোগল-সরাইএ গিয়েই তার সত্য যাচাই হ'য়ে যাবে। তুমি যে ভাব্‌ছো কথার হেঁয়ালি সাজিয়ে এড়িয়ে যাবে; তা হ'চ্ছেনা। ··· আচ্ছা অনি, প্রোফেসর চৌধুরীর সঙ্গে বুঝি তোমাদের বহুপূর্ব্বে থেকেই আলাপ ছিল?"

"হাঁ"—বলিয়াই, অনি আবার সহসা একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সুরথবাবুদের সঙ্গে নিরঞ্জন-দার অত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল কিরূপে, অনি তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। সে ভাবিয়াছিল —নিরঞ্জন-দাকে একবার জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু নানা কাজের ভিড়ে, সে কথা আর মোটেই খেয়াল হয় নাই। মঞ্জিষ্ঠাদির কাছে অনি প্রোফেসর চৌধুরীর নাম অনেকবার শুনিয়াছে। হয়তো ইনিই—; নাঃ। কিন্তু মঞ্জিষ্ঠাদির কথায় যেন নিরঞ্জন-দা

কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন! অনির মনে একটু বাধা হইতেছিল, তবে তাহা কাটাইয়া উঠিতে তাহার বিশেষ বিলম্ব হইল না।

* * * *

নানা আপত্তি সত্ত্বেও, অনি মোগলসরাইএ একটী দিন কাটাইয়া যাইতে বাধ্য হইল। অনেকদিনের পর সুলতার সঙ্গ পাইয়া অনির উদ্বেলিত মনটা অনেকখানি শান্ত হইয়াছিল; কিন্তু সে ক্ষণিকের শান্তি ক্ষণিকেই মিলাইয়া গেল। সুলতার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময়, সে যখন অনিকে জড়াইয়া ধরিয়া শিশুর মতই কাঁদিয়া ভাসাইল, অনির আমূল শান্তি আবার মুহূর্ত্তে উপাড়িয়া পড়িল।

সুলতা ছিল নিতান্ত আপন-ভোলা মেয়ে; পল্লী-বালার মত সরল ও অকুণ্ঠ মনের স্বচ্ছন্দ-গতিতে তাই সে বলিয়া বসিল— "দিদি, সেবার না হয় ডাক্তার সাহেবের উপর অভিমান ক'রে পালিয়েছিলে, তাই এতোদিন আস নি। এবারে কিন্তু সকাল সকাল ফির্‌তে হবে—তা ব'লে দিচ্ছি।"

এ কি! একটা দারুণ ঝাঁকানি লাগিয়া, অনির সারা মন দুলিয়া উঠিল। ঝ'ড়ো হাওয়ায় জীর্ণ-পাতার আবরণ খুলিয়া পলাশের রাশি রাশি রাঙা ফুল যেন আলোর মায়ায় নাচিয়া উঠিল। সুলতার সরল কথার খোঁচাটুকু হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য, তাহার ঠোঁট দু'খানিতে আঙ্গুলের একটা টোকা মারিয়া অনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা।" কিন্তু তাহার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত হইতে লাগিল—" . ...ডাক্তার সাহেবের উপর অভিমান......!

সারাপথ চিন্তা ও আলোড়নের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে অনি অবসন্ন মনে কলিকাতায় ফিরিল। প্রাণপাত পরিশ্রমে এতদিন ধরিয়া যে শান্তির কুটীরখানি সে বাঁধিয়াছিল, এবার আর অনি তাহার শীতল ছায়ায় বুকের ব্যথা জুড়াইতে পারিল না। সরলা স্থুলতার মুখের সেই অতর্কিত কয়েকটী কথা—"ডাক্তার সাহেবের উপর অভিমান···" তাহার চিত্তের সমস্ত শক্তিকে ব্যর্থ করিয়া, মনের ভিতর শুধু একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতেছিল।

অনির বিষণ্ণ বিমনা চেহারা দেখিয়া—চঞ্চলা কণা যখন 'ছুটা-ছুটি' ফেলিয়া—আচম্বিতে বেদনা-ম্লান মুখে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলে—"মা-মণি, অমন ক'রোনা ; তোমার অসুক্ ক'রেচে ?" মুহূর্ত্তের জন্য অনি সব ভুলিয়া যায় ; ক্ষিপ্রহস্তে কণাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বারবার চুম্বন করে—সেই বিহ্বল-করা মুহূর্ত্তটীকে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করিবার প্রাণপণ চেষ্টায়। কিন্তু সে প্রলেপ পরক্ষণেই মুছিয়া যায়।

মেজরের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া—আজ সেই শোচনীয় পরিণতির একমাত্র কারণ ভাবিতে গিয়া অনির মনটা যে-ব্যথায় ভরিয়া উঠিতেছিল, তাহা সে কোনোমতেই শান্ত করিতে পারিতে-ছিল না। বেনারস হইতে চলিয়া আসিবার সময় সে সত্যই মেজরের উপর প্রচণ্ড অভিমান করিয়া আসিয়াছিল। সেদিন নিজের ত্রুটি দেখিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। কিন্তু আজ সে পরিষ্কারভাবে বুঝিল যে, তাহার তুলনায় মেজরের অপরাধ কত লঘু। মৃত্যুকালে দাদু যখন তাহাকে উপদেশের ছলে আদেশ জানাইয়া গিয়াছিলেন, তখন আত্মাভিমানের গর্ব্বে অনি

আপনাকে সেই ইঙ্গিতের অনেক উপরে টানিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সেই গর্ব্বের ছায়াতলে, তাহারই অজ্ঞাত প্রাণের কোণে ধীরে ধীরে যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল—শত চেষ্টায় তাহাকে সে তুলিয়া ফেলিতে পারে নাই। নহিলে, দাদু যে কথাটা নিষ্প্রয়োজনে প্রকাশ করেন নাই, সেটাকে সে প্রয়োজনেও অত সাবধানে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল কেন? আজ অনি সর্ব্বপ্রথম তাহার নিজের অন্তরের দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়া শিহরিয়া উঠিল,—ভুল কাহার এবং কোথায়!

পুরীতে আসিয়া, প্রকৃতির নূতন আবেষ্টনের ভিতর—প্রথম প্রথম কয়েকটী দিন অনির মন্দ লাগিল না। মনটা যেন মাঝে মাঝে অনিকে তাহার অতীত গ্লানির স্তূপ হইতে টানিয়া সম্মুখের পানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু পথের মায়া তখন অনির প্রাণ হইতে এতো বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, শান্তির ছায়াগুলি তাহার জীবনে কোনোরূপেই রেখাপাত করিতে পারিতেছিল না।

কণাকে লইয়া অধিকাংশ সময় অনি সমুদ্রের ধারে কাটায়। কোলাহল তাহার মোটেই ভাল লাগে না। মানুষের কলরব হইতে বহুদূরে, জনহীন বেলাভূমির প্রান্তে গিয়া অনি কণার হাত ধরিয়া দাঁড়ায়। সেই সীমাহীন জলরাশির সঙ্গে নিজের জীবন মিলাইয়া লইবার জন্য অনি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে কাণ পাতিয়া যেন সমুদ্রের ভাষা শুনে। এমনি কূলহীন—বিরামহীন তাহার জীবন সমুদ্রের এক একটী ঢেউএর আঘাতে তাহার বাইশ বৎসরের এই রিক্ত জীবনের অফুরন্ত ব্যর্থতার এক একটী অশ্রুধারা যেন বুকের ভিতর উদ্বেলিত হইয়া উঠে। অনির ইচ্ছা করে—মনের অস্তিত্বকে সেই অতলের মাঝে ডুবাইয়া দিতে; কিন্তু পারে না। ওপারের ক্ষীণ আকাশ রেখার মত তাহার বিক্ষুব্ধ মনের চারিদিকে ভাসিয়া উঠে মেজরের পাণ্ডুর মুখ—

মেজরকে সে কোথায় ঠেলিয়া ফেলিয়াছে। জীবনের নিকটতম দ্বারে যাহাকে সে একদিন প্রথম অতিথির মত অভ্যর্থনা করিয়াছিল, তাহাকেই আজ সে অতীতের বিলুপ্তির ভিতর ডুবাইয়া দিতে চায় কেন? এই যে সে আজ প্রাণের সমস্ত আলো-বাতাসের পথগুলিকে রুদ্ধ করিয়া নিজের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযান

করিয়া চলিয়াছে, ইহার কাল্পনিক সার্থকতার আশায় সে কতক্ষণ বাঁচিবে? সে তো জীবনে কোনোদিন এমন কোনো সম্বল পায় নাই, যে-টুকু লইয়া তাহার এতবড় লোকসানের ক্ষতিপূরণ করিবে। কবে কোন সুদূর অতীতে তাহার জীবনে উৎসব হইয়া গিয়াছিল; তাহা সে আজ আর স্মরণ করিতেও পারে না। তাহার মনে পড়ে শুধু কান্নার মোছা-মোছা কয়েকটী কাহিনী। তাহা লইয়া মানুষ কতদিন আর শুষ্ক মরুপথের উত্তপ্ত বালুকায় পা ফেলিয়া চলিতে পারে! যাহা কিছু আনন্দের সম্বল সে জীবনে পাইয়াছে—তাহার স্মৃতিও আজ ক্ষাণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে। শুধু মা, বাবা, আর দাদুর স্নেহ—তাই অনির পাথেয়, চিরদিনই পাথেয় হইয়া থাকিবে; কিন্তু পান্থশালা?—— অনির সারা মন আলোড়িত করিয়া ভাসিয়া উঠে—গভীর কাতরতা-ভরা মেজরের সেই করুণ দৃষ্টি—

অনির চোখে জল আসে। নিজেকে সে কোনোমতেই সংবরণ করিয়া রাখিতে পারে না। সব কথা, সকল চিন্তা তাহার মনের ভিতর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। সে যদি অমনি করিয়াই মেজরকে ফেলিয়া আসিবে, তবে আজমগড়ে যাইবার কী প্রয়োজন ছিল? মেজরতো অক্ষমের মত তাহার সাহায্য ভিক্ষা করেন নাই। সে-ই ঝড়ের মত গিয়াছে আর চলিয়া আসিয়াছে, শুধু অভিনয় করিয়া। কিন্তু সে অভিনয়-করিবার অধিকার কি তাহার আছে?

কণা কখন অনির হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, তাহা সে বুঝিতেও পারে না। অনি তন্ময় হইয়া ভাবে; তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিয়া উঠে। মেজর তাহার সব অধিকার—অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছেন; একটীবারও মুখ ফুটিয়া অনির কোনো

কাজে তিনি বাধা দেন নাই। অনি আপন খেয়ালে তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দিয়াছে, তাঁহার আনন্দের উপাদানগুলি তাঁহারই চোখের সম্মুখে ভাঙিয়া চুর-মার করিয়াছে, তিনি শুধু পরাজয়ের গ্লানি মাথায় করিয়া নীরবে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছেন। মেজরের উপর এমন কী অধিকার তাহার ছিল, যাহার জোরে সে অত বড় আধিপত্য করিয়াছে? মেজরকে তো সে তাঁহার অপরিসীম স্নেহ ও সহানুভূতির বিনিময়ে বিন্দুমাত্র শান্তি দিতে পারে নাই। সে শুধু তাঁহার জীবনে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে; আবার নিজেই তাঁহার উপর অভিমান করিয়া অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া আসিয়াছে। নিতান্ত আপন-ভোলা যে সুলতা—তাহার চোখেও অনির সে অভিমান গোপন ছিল না।

অসহ্য যন্ত্রণায় অনির বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠে। আঁচলে মুখ ঢাকিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে চায়। তাহার অন্তরে অন্তরে বঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা লুটোপুটি খাইয়া আর্ত্তনাদ করে।

সহসা সমুদ্রের গর্জ্জনেই বুঝি তাহার সংবিৎ ফিরিয়া আসে। কণার কথা মনে হইতেই অনি মুখ তুলিয়া চায়; দেখে কণা আপন-মনে ঝিনুক কুড়াইতে কুড়াইতে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। সজল-চোখে অনি নির্নিমেষে কণার পানে চাহিয়া থাকে; এক-গোছা ফোটা গুলঞ্চের মত কণা হেলিয়া দুলিয়া সেই বিস্তীর্ণ বালুকাময় তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অনির মনে হয় তাহার অমনি মরুময় জীবনপথে কণা একটী আনন্দময় শুভ্রধারা।

কণাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া অনি সযত্নে তাহার কপালের উপরকার চুলগুলি সরাইয়া দেয়। বেলা শেষে যখন

তাহারা বাড়ী ফিরে, তখন সমুদ্রের তীরে প্রবাসীর মেলা বসিয়া যায়। মনের অবসাদ চাপিয়া রাখিবার জন্য অনি বারবার কণার সঙ্গে কথা বলিবার ব্যর্থ প্রয়াস করে। কিন্তু কোনো কিছুই জমাইয়া তুলিতে পারে না।

কণার চিবুকটী নাড়িয়া দিয়া অনি সস্নেহ ভৎ‍র্সনার সুরে বলিল—"দুষ্টু মেয়ে, কখন পালিয়েছিলে?"

কণাও ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে বলিল—"তুমি কেবল কেবল কাঁদ্‌বে কেন? আমি তোমার কণি-মা হব না।"

অনি বুঝিল—তাহার চোখে জল দেখিয়া কণার বুকেও ব্যথা লাগিয়াছে।

কিন্তু মনে কোনো দাগ পড়িবার মত বয়স এখনো কণার হয় নাই, তাই সে আবার পরমুহূর্ত্তেই হাসিয়া বলে—

"মা-মাণ, বেলার অনেক ভাল ঝিনুক্ আছে। মামী-মা বেলার মাকে দিদি বলে। বেলারা পরশুদিন কাশী চ'লে যাবে। তুমি কাশী দেখেছ?"

কণা বুঝিল না—সে অনির কোথায় আঘাত করিল। অনি আর কোনো উত্তর দিতে পারিল না। এতক্ষণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া সে যাহা হইতে নিজেকে কোনোরূপে একটু টানিয়া আনিয়াছিল, কণা আবার প্রচণ্ডবেগে সেই ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যেই তাহাকে ঠেলিয়া দিল।

উদ্‌গত বেদনাকে চাপিবার জন্য অনি মুখে আঁচল গুঁজিয়া হন্‌হন্ করিয়া পথ চলিতে লাগিল। তাহার মনে হইল—সমস্ত পৃথিবী বুঝি তাহার মনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিবে।

একটা ভীষণ অবসাদে মেজরের দেহমন বিকল হইয়া পড়িল। এত বড় পরাজয় সহ্য করিবার মত মনের জোর তখন আর তাঁহার ছিল না। অনিকে উপলক্ষ্য করিয়া একবার তিনি নিজের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, অনি যে আবার দম্‌কা হাওয়ার মত তাহারি মাঝখানে আসিয়া—তাঁহাকেই পরাজয়ের গ্লানিতে ভরিয়া দিয়া যাইবে, তাহা মেজর কখন কল্পনাও করেন নাই। কিন্তু এই পরাজয়ের ভিতরেও এমন একটা তৃপ্তি ছিল, যাহা আজ মেজরকে বার বার অশ্রুসিক্ত করিয়া তুলিতেছিল। সেটুকু অনির অযাচিত করুণা। অনির কাছে তাঁহার আর দাবী করিবার কোনো অধিকারই নাই; অন্ততঃ সে শক্তিটুকু তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তবুও অনির স্মৃতিপট হইতে তাঁহার অস্তিত্ব যে নিশ্চিহ্নরূপে মুছিয়া যায় নাই, নিজের সমস্ত লাঞ্ছনাকে দূরে ঠেলিয়া—অনি যে আজ তাঁহার পাশেই ছুটিয়া আসিয়াছে, তাঁহাকে তুলিয়া লইবার জন্য সস্নেহে হাত বাড়াইয়া দিয়াছে; নিঃস্বের শেষ সম্বলের মত—ইহারই গৌরব—সব অবসাদের ভিতরেও মেজরের বুকখানাকে স্ফীত করিয়া তুলিতেছিল।

অনি যে কয়েক ঘণ্টা আজম্‌গড়ে ছিল, তাহার ভিতর মুখ-ফুটিয়া কোনো কথা না বলিলেও, মেজরের জীবনে সে একটা আমূল সংস্কার করিয়া দিয়া গিয়াছিল। মেজর প্রাণপণে আবার নিজেকে কর্ম্মের মধ্যে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জীবনের গ্রন্থি-সূত্র এতো শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল যে, স্রোতের মুখ হইতে ফিরাইয়া লইলেও, তিনি আর বেশীদিন তাহা শক্ত-হাতে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না।

অনির নীরব শাসন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া মদ্যপান ত্যাগ করিলেও, পূর্ব্বের সেই অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই মেজরের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িল।

অনির অনুরোধ রক্ষা ও নিজের কর্ত্তব্য-পরায়ণতা—উভয় দিক্ দিয়াই নিরঞ্জন যথাসাধ্য মেজরের তত্ত্বাবধান করিতে ত্রুটি করেন নাই। বিপন্নের সাহায্য ও রোগীর সেবায় তিনি চিরদিন মুক্তহস্ত ও দৃঢ় হইলেও, শয্যাশায়ী মেজরের অবস্থা যখন ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল, নিরঞ্জনবাবু বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। জীবনে রোগীর সেবা দ্বারা সাধারণ রোগ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু মেজরের এই জটিল ব্যাধি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতা ছিলনা। অনি ও বনবিহারী-বাবুর পূর্ব্ব পরামর্শ মত, নিরঞ্জন সকল কথা বিস্তৃতভাবে জানাইয়া বনবিহারীবাবুকে সত্বর আসিবার জন্য পত্র লিখিয়া দিলেন।

বনবিহারীবাবু আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহারও দুশ্চিন্তা কম হইল না। অতিরিক্ত সুরাপানের সাধারণ পরিণাম যাহা হইয়া থাকে, মেজরের অবস্থাও ঠিক তাহাই দাঁড়াইয়াছে। বনবিহারীবাবু তাঁহার অবস্থাদি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন—মেজরের লিভার ও অন্ত্রের মধ্যে ক্ষত হইয়াছে। লিভার অ্যাব্‌সেসের দুরারোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই অবিদিত ছিল না।

সকল দিক বিবেচনা করিয়া বনবিহারীবাবু নিরঞ্জনের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—চিকিৎসার জন্য মেজরকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়াই বিধেয়। যদি লিভারের উপর

অস্ত্রোপচার করিতে হয়, তাহা হইলে কলিকাতা ভিন্ন অন্য কোথাও তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বিশেষ নিরাপদ নহে। তবে সে বিষয়ে মেজরের অভিমত লওয়াও প্রয়োজন।

পরদিন সকালে বনবিহারীবাবু প্রকারান্তরে মেজরকে তাঁহার রোগের কথা জানাইয়া, চিকিৎসা সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং এ অবস্থায় কলিকাতায় যাওয়াই যে প্রশস্ত সে কথাও তিনি মেজরের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

বনবিহারীবাবু না বলিলেও, মেজর নিজের রোগ সম্পূর্ণ-ই বুঝিতেছিলেন। রোগ ও চিকিৎসাদি সম্বন্ধে তাঁহারও কিছু অবিদিত ছিল না। তথাপি, কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া মেজর বলিলেন—"এখন আর তা হয় না ক্যাপ্টেন্, তাতে টাকা-কড়ির দরকার; তার উপর পাওনাদার বহু টাকার দাবী দিয়ে নালিশ করে'ছে। ঐ দেখুন, টেবিলের উপর তার সমন পড়ে' আছে।"

টেবিলের উপর হইতে সমনখানি তুলিয়া লইয়া বনবিহারীবাবু দেখিলেন—এটর্ণি ননীলাল মল্লিক প্রায় বিশ হাজার টাকার দাবী দিয়া মেজরের নামে নালিশ করিয়াছেন। এই অল্পদিনের মধ্যেই এত টাকা ঋণ হইয়াছে দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন।

মেজরের কথার উত্তরে বনবিহারীবাবু বলিলেন—"তা হোক্। তাই ব'লে জীবনকে অবহেলা করা চলে কি? আর কেসের জন্যেও তো কোল্‌কাতায় যাওয়া দরকার। সম্প্রতি যেমন ক'রে হয় চ'ল্‌বেই। টাকার সমস্যা নিয়ে ভাব্‌বার সময় এখন নয়; সে পরে দেখা যাবে। নিরঞ্জনবাবু আর আমি যা হোক্ ক'রে চালিয়ে নেব'খন।"

বনবিহারীবাবু ও নিরঞ্জন প্রায় জোর করিয়াই মেজরকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

*   *   *   *

মেডিক্যাল কলেজের একটা কেবিন ভাড়া করিয়া নিরঞ্জন ও বনবিহারীবাবু মেজরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে দেখিয়া ডাক্তারেরা সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িতেছিলেন। অথচ মেজর নিজের রোগ সম্বন্ধে এতো উদাসীন হইয়া গিয়াছিলেন যে, নিজের যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ বিষয়েও তাঁহার কোনো অনুভূতি ছিল বলিয়া মনে হইতেছিল না। নিরঞ্জন ও বনবিহারীবাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহার সেবা-যত্ন করিতেছিলেন। কিন্তু মেজরকে দেখিয়া মনে হইতেছিল—যেন তিনি জানিয়া-শুনিয়াই মৃত্যুকে অতি ধীর ও অচঞ্চলভাবে বরণ করিয়া লইতেছিলেন।

মেজরের অসুস্থতার কথা অনিকে জানাইবার জন্য সেদিন বনবিহারীবাবু তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু অনি তখনো কলিকাতায় ফিরিয়া আসে নাই। মেজরের এত বড় অসুখের কথা অনিকে না জানাইয়া বনবিহারীবাবু কোনরূপেই সোয়াস্তি পাইতেছিলেন না। তিনি অনিদের পুরীর ঠিকানা সংগ্রহ করিবার চেষ্টাও করিলেন। কিন্তু দারোয়ান কোনো খবরই দিতে পারিল না; এমন কি—তাঁহারা পুরীতেই আছেন, না সেখান হইতে অন্য কোথাও গিয়াছেন, দারোয়ান সে সংবাদটুকু পর্য্যন্ত রাখে না।

উকিল নিযুক্ত করিয়া বনবিহারীবাবু মেজরের কেসের তদন্ত

করিতেছিলেন ; কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। এটর্ণি ননীলাল মেজরের উপর ডিক্রির পরোয়ানা জারি করিলেন। ননীলাল মেজরের পিতার আমলের এটর্ণি ছিলেন। তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তির অনেক কাগজপত্রই তাঁহার নিকট ছিল। এটর্ণি সেই সকল সম্পত্তিও অ্যাটাচ্ করিয়া নোটিশ জারি করিলেন। মেজর পরোয়ানাগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন মাত্র। ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না। তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, ঐ সকল সম্পত্তির উপর এটর্ণির বরাবরই লোভ ছিল।

মোকদ্দমার রায় বাহির হইবার কয়েকদিন পরেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল যে পূর্ব্বোক্ত ডিক্রি সম্প্রতি স্থগিত রাখিবার জন্য জজসাহেব আবার নূতন করিয়া আদেশ দিয়াছেন। তৃতীয় পক্ষ উক্ত সম্পত্তির এক্সিকিউটাররূপে আপত্তি জানাইয়াছে। 'স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরীর সম্পত্তি তাঁহার পুত্রের ঋণের জন্য এ্যাটাচ্ করা যাইতে পারে না। তিনি তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি পুত্রবধূর নামে উইল করিয়া গিয়াছেন।'

মেজরের কর্ণে এ সংবাদও পৌঁছিল ; কিন্তু মেজর কোনো কথাই বলিলেন না। উকিলের পরামর্শ মত বনবিহারীবাবু মেজরের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ নির্ব্বিকার ভাবেই উত্তর করিলেন—"যেখানে শেষের ওয়ারেণ্টই জারি হ'য়ে গেছে, ক্যাপ্টেন্, সেখানে আর ও-সব ছোটখাটো ওয়ারেণ্ট নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল।"

মেজরের কথায় বনবিহারীবাবুর মনটা যেন বারেকের জন্য দুলিয়া উঠিল।

কয়েকদিন পরে চিকিৎসকগণ এক্স-রে ফটো লইয়া স্থির করিলেন—অস্ত্রোপচার করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। নিরঞ্জন ও বনবিহারীবাবু উভয়েই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের প্রাণে একটা আসন্ন বিপদের ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল।

সম্পত্তি আবদ্ধ করিয়া লইবার চেষ্টা বিফল হওয়ায় এটর্ণি ননীলাল মল্লিক বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ধারণা হইল,—ডাক্তার বোধ হয় জানিয়া শুনিয়াই তাঁহাকে ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে এরূপ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। এটর্ণি আইনের সাহায্যে মেজরের উপর ডিষ্ট্রেস্ ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া সেই দিনই তাহা জারি করিলেন! ওয়ারেণ্ট দেখিয়া মেজর একবার একটু ক্ষীণ হাসিলেন মাত্র। কিন্তু সে হাসি এতই নিষ্প্রভ যে, দেখিলে ভয় হয়।

বনবিহারীবাবু কয়েকদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন—মেজর যেন কি একটা কথা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছেন না। মেজরের সঙ্কোচটুকু লক্ষ্য করিয়াই বনবিহারীবাবু নিজে হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেজর, আপনি কি কিছু ব'ল্‌তে চান্? বন্ধুর কাছে সঙ্কোচ ক'র্‌বার—"

বনবিহারীবাবুর কথা শেষ না হইতেই মেজর বলিলেন—"জানি, বন্ধু, তোমায় জানি। এই বিপন্ন অবস্থার বন্ধু তুমি; তোমার কাছে আজ আর আমার কোনো সঙ্কোচই নেই—এই জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে।"

বনবিহারীবাবুর প্রতি তাঁহার সমস্ত হৃদয় যেন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। মেজর প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বনবিহারীবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"ও কথা বল্‌বেন না মেজর! আপনি নিশ্চয়ই সেরে উঠ্‌বেন। অনিকে একবার সংবাদ দিতে পার্‌লে ভাল হো'ত।"

"আমিও ঐ কথা ব'লতে যাচ্ছিলুম ক্যাপ্টেন! জীবনটার আগাগোড়াই ভুলের বোঝায় ভারি হ'য়ে গেছে। এখনো যদি কিছু কমাতে পারি।" মেজর আবার একটু হাসিয়া বনবিহারী-বাবুর মুখপানে চাহিলেন।

বনবিহারীবাবুর হাতখানিকে চাপিয়া ধরিয়া মেজর পুনরায় ব্যথিত স্বরে বলিলেন—"বন্ধু, হতাশ হ'চ্ছ কেন? তোমার আর উদারপ্রাণ নিরঞ্জনবাবুর ঋণ অপরিশোধ্য হলেও আর একজনের জন্য—এখনও বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে;—শুধু অনি—অনি——অনির সঙ্গে একবার দেখা হ'লে তার কাছে……"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসে মেজরের রোগশীর্ণ বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল।

২৭

আজ তিন দিন হইল স্থরথবাবুরা পুরী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। ফিরিবার পথে ভুবনেশ্বরে নামিয়া কয়েকদিন কাটাইয়া আসায়, আরো দেরী হইয়া গিয়াছে। অনি ও নীলিমা কণার জন্মোৎসবের আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল; আজ কণার জন্মদিন।

অনির মনটা আজ থাকিয়া থাকিয়া উর্ম্মিলার জন্য কাঁদিয়া উঠিতেছিল। হায় অভাগি! আজ তোর কণার জন্মদিন। কিন্তু দুঃখের মধ্যেও অনি একটু শান্তি পাইতেছিল—শুধু এই কথা ভাবিয়া যে, সে কণার মায়ের আসনখানিতে নিজের বুভুক্ষু হৃদয়কে বসাইবার সৌভাগ্য পাইয়াছে।

আপনার হাতে কণাকে সাজাইয়া দিয়া, অনি ঠিক জন্মক্ষণটীতে তাহাকে পাঠাইল—মামাবাবুকে প্রণাম করিবার জন্য। কণাকে পাঠাইয়া অনি নিজেও জোড়হাতে ভগবানের চরণে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল—"ঠাকুর! কণির জীবনকে সার্থক ক'রে তোল!"

কণা নাচিতে নাচিতে স্থরথবাবুর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—"মা-মণি, মামাবাবু কি দিয়েচেন খ্যাখো।" স্থরথবাবুর নিকট হইতে একখানি ছবির বই পাইয়া তাহার কচি বুকখানি আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

অনি চাহিয়া দেখিল—মরোক্কো চামড়ায় বাঁধানো একখানা স্থন্দর ফটো এ্যালবাম্ স্থরথবাবু আজ কণাকে উপহার দিয়াছেন। কণাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া অনি এ্যালবাম্‌খানি দেখিতে লাগিল। কণার আনন্দধ্বনি শুনিয়া নীলিমাও তখন তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ্যালবামের প্রথম পাতাটি উল্টাইতেই সহসা একটি দম্পতির ফটোগ্রাফ্ দেখিয়া অনি যেন চমকিয়া উঠিল। "এ কি!"

নীলিমা ছবিখানির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—"উর্ম্মিলা আর অরুণবাবু—কণার বাবা।"

কণার বাবা! এ যে মেজর! মেজর উর্ম্মিলার স্বামী—অনির সর্ব্বাঙ্গ যেন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল; তাহার মুখ দিয়া আর কোনো কথা বাহির হইল না। দুই হাত দিয়া অনি কণাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল—অতি নিবিড় ভাবে। তাহার চোখ হইতে বড় বড় জলের ফোঁটাগুলি গড়াইয়া পড়িতে লাগিল কণার মাথার উপর, উচ্ছ্বসিত স্নেহের মন্দাকিনীর মত।

মেজরের উপর অনির সব অভিমান ও সব অশ্রদ্ধা যেন সেই অশ্রুজলে ধৌত হইয়া গেল। অনি আজ আর মেজরকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা না করিয়া পারিল না। মেজর কণার পিতা। আর কণা! কণা অনির মরুজীবনের ছায়াবীথি, শূন্য প্রাণের একমাত্র অবলম্বন—তাহারই বুকজোড়া স্নেহের পুতুলি।

* * * *

ঝি আসিয়া সংবাদ দিল যে, বাহিরে একজন ভদ্রলোক গুরু-মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া অনি কণাকে সঙ্গে করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আজ হঠাৎ বনবিহারীবাবুকে দেখিয়া অনির মনটা আনন্দে ভরিয়া উঠিল; কণার জন্মদিনে বনবিহারীবাবুকে সে অতিথি রূপে পাইয়াছে।—তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া অনি হাসিয়া বলিল—

"দাদা, আজ আমার খুব সৌভাগ্য যে আপনাকে বিনা-নেমন্তন্নেই পেয়েছি। আজ কণার জন্মদিন। এই দেখুন, কেমন কোল-ভরা ফুট্‌ফুটে মেয়ের মা হ'য়েছি।"

বনবিহারীবাবুর কাছে এ সংবাদ খুব আনন্দের হইলেও তাহা জ্ঞাপন করিবার মত মনের অবস্থা তখন তাঁহার ছিল না! তিনি নিতান্ত বিমর্ষ ভাবেই বলিলেন—"কিন্তু, আমার তো থাকবার সময় নেই বোন্‌। মেজরের খুব অসুখ; তাই তোমাকে একবার খবর দিতে এসেছি; তাঁরও খুব আগ্রহ তোমার সঙ্গে একবার দেখা করা—আর এই আগ্রহের জন্যই বোধ হয় এখনও···"

বনবিহারীবাবুর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইতেছিল না।

নিমেষে অনির সমস্ত আনন্দকে ঢাকিয়া একটা বেদনা ও আতঙ্কের কালো মেঘ তাহার হৃদয়কে কাঁপাইয়া তুলিল। অনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি কোথায় আছেন?"

"এইখানেই, মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে। তুমি একবার গেলে ভাল হ'ত।"

"একটু অপেক্ষা করুন, আমি নিশ্চয়ই যাবো দাদা, আপনার সঙ্গেই যাবো।"

অনি তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল।

বনবিহারীবাবুর অনুরোধ ও নিজের একান্ত ইচ্ছায়, অনি তখনই নীলিনাকে জানাইয়া, কণাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। মেজরকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ তখন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে, মহিলা-নিবাসের সম্মুখে গাড়ী দাঁড়

করাইয়া, অনি মঞ্জিষ্ঠার নামে একখানি পত্র লিখিয়া, দারওয়ানের হাতে দিল, এবং তখনি 'সমিতি'তে মঞ্জিষ্ঠার নিকট তাহা পৌছাইয়া দিবার জন্য বারবার বলিয়া দিল।

কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অনি যখন দেখিল—মেজর রোগশীর্ণ হইয়া প্রায় শয্যার সহিত বিলীন হইয়া পড়িয়া আছেন, এমন কি সজীব কি না তাহাও সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না, তাহার ব্যথিত হৃদয় হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই মেজর! তাহার সেই পরম হিতৈষী বন্ধু, যাঁহার জীবনে একদিন সমৃদ্ধি আপন গৌরবে বহিয়া চলিয়াছিল, আজ মৃত্যুশয্যায়, সরকারী চিকিৎসালয়ে আত্মীয়-স্বজনহীন পথিকের মত আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

অনিকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, মেজর একবার চোখ তুলিয়া অনির মুখপানে চাহিলেন। সে দৃষ্টি বড় করুণ—মর্ম্মস্পর্শী। অনিকে বসিতে বলিয়া মেজর শীর্ণ হাত দু'খানি তুলিয়া নমস্কার করিলেন।

অনি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—"ও কি! আমার সঙ্গে ফর্ম্যালিটি কেন মেজর?"

মেজর অনির মুখপানে চাহিয়া বলিলেন—"জীবনে অনেক ভুল ক'রেছি অনি; এতোদিন যা বুঝতে পারিনি, আজ তা' চোখের সাম্‌নে সব স্পষ্ট হ'য়েই ফুটে উঠেছে। সে সবের ভার আর সহ্য ক'রতে পারছি না, তাই আজ জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তোমায় একবার ডেকে পাঠিয়েছি, শুধু ক্ষমা চেয়ে;…… আমায় ক্ষমা কোরো অনি—" তাঁহার ঠোঁট দু'খানি কাঁপিতেছিল।

মেজরের কথা শেষ না হইতেই অনি তাড়াতাড়ি নমস্কার

করিয়া বলিল—"ছিঃ, ও-কথা মনেও আনবেন না। বহুদিন পূর্ব্বেই ভগবানের কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করেছি—তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন। আপনি সেরে উঠুন; জীবনের ভুল শোধ্‌রাবার সময় অনেক পাবেন।"

"তোমার ক্ষমা পেয়েছি—এইটা জানতে পারলেই আমার বীতশ্রদ্ধ জীবনে শ্রদ্ধা ফিরে আস্‌তে পারে—কিন্তু যদি তাতেই বঞ্চিত থাকি, তবে আর কেন মরণের পথ হতে ফিরে আসা…" মেজরের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

অনি প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার জন্য কণাকে কোলের উপর উঠাইয়া লইয়া, মেজরের পানে চাহিয়া বলিল—"মেজর! একে চিন্‌তে পারেন? এই আধফোটা ছোট্ট গোলাপটিকে?"

মেজর যথাসাধ্য নিজের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করিয়া কণার মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

মেজরের উৎসুক দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া অনি বুঝিল—তিনি যেন তন্ময়ভাবে স্মৃতির পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতেছেন।

অনিরও মনের মধ্যে একটু ইতস্ততঃ ভাব আসিয়া পড়িল; কিন্তু পরক্ষণে সেটুকু কাটাইয়া লইয়াই, অনি কণার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল—"চিন্‌তে পার্‌লেন না মেজর? কণা, উর্ম্মিলার স্মৃতিচিহ্ন!"

মেজর যেন সহসা চম্‌কাইয়া উঠিলেন; উর্ম্মিলার স্মৃতিচিহ্ন! মেজরের অজ্ঞাতসারেই তাঁহার শীর্ণ বাহু দুইটি কণার দিকে প্রসারিত হইয়া আসিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা শয্যার উপর এলাইয়া পড়িল। মেজর যেন ইচ্ছা করিয়াই সেই প্রসারিত

বাহুকে গুটাইয়া লইলেন। তাঁহার চোখ দুইটি তখন জলে ছাপাইয়া উঠিতেছিল।

সহসা আবেগভরে মেজর বলিয়া উঠিলেন—"উঃ, উর্ম্মিলা! উর্ম্মিলার মোহেই জীবনটা আজ কোথায় নেমে প'ড়েছে! ঐ উর্ম্মিলাকে ঘিরে একদিন বেঁচে থা'কতে চেয়েছিলুম। উর্ম্মিলার জন্যে জীবনে কী না ক'রেছি! বাবা বড় সাধ ক'রে যাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তাকে বঞ্চিত ক'রে, তার সম্ভাবনাপূর্ণ কচি জীবনটাকে চিরদিনের মত ব্যর্থ ক'রে দিয়েছি। অমন দেবতার মত লোক ছিলেন সমাধীশবাবু—তাঁকেও প্রবঞ্চিত ক'রে কত বড় একটা মিথ্যার জাল বুনেছিলুম, আজ আর তা ভাবতেও পারিনা। যুদ্ধে যাবার অনেক আগেই যে আমার বিয়ে হ'য়ে গেছ্‌ল সে কথা তাঁদের কা'কেও কোনোদিন জানাইনি। বড়লোক হ'য়ে, উর্ম্মিলাকে পাবার যোগ্য হ'য়ে ফির্‌বো বলে' জীবনকে তুচ্ছ ক'রে মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। বাপ ঠাকুর্দ্দার কুলগৌরবকে পায়ে দ'লে, যুদ্ধে গিয়ে বড়লোক হবার আকাঙ্ক্ষায় পশুর মত জীবন কাটিয়েছি। ওঃ অন্নপূর্ণা! পরলোকে গিয়েও তুমি হয়তো আমায় ক্ষমা ক'র্‌তে পারো নি। আর উর্ম্মিলা! জীবনের সব কিছু নিয়েও, তোমার তৃপ্তি হো'ল না! বিশ্বাসের মূল যে অতো আল্‌গা হ'য়ে পড়্‌'বে তা স্বপ্নেও ভাবি নি।" মেজরের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।

মেজরের কথার সবটুকু তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিলেও অনির বুকখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

মঞ্জিষ্ঠা পূর্ব্বেই ঘরের মধ্যে আসিয়াছিল। মেজর ও অনি

কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই। মেজরের শেষের কথাগুলি যেন মঞ্জিষ্ঠার প্রাণে শেলের মত বিঁধিল। নিজেকে সংযত করিতে না পারিয়া সে উষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিল—"দাদা, জীবনের খেয়া-ঘাটে দাঁড়িয়েও নিজের সেই সঙ্কীর্ণতা ভুল্‌তে পারো নি। উর্ম্মিলার মত সাধ্বীর পবিত্র জীবনে ঐ ঘৃণিত কালি মাখিয়েছিলে বলে'ই আজ এই পরিণামে এসে দাঁড়িয়েছ। উর্ম্মিলা সাধ্বী ছিল; সে সাধ্বীর মতই মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রে বেচেছে। যে প্রোফেসর চৌধুরীর নাম শুনে' তুমি হীন ধারণা বুকে পুষে রেখেছিলে, ইনিই সেই নিরঞ্জন চৌধুরী; উনি যে কত বড়—তা' কল্পনা ক'র্‌বার ক্ষমতাও তোমার নেই—।"

নিরঞ্জন আপন মনে তখন মেজরের জন্য ফল ছাড়াইতেছিলেন। অনি অবাক্ হইয়া নিরঞ্জন ও মঞ্জিষ্ঠার পানে চাহিল। মঞ্জিষ্ঠাকে এত উগ্র সে কখনো দেখে নাই। আজকার সবই যেন অনির কাছে একটা হেঁয়ালির মত বোধ হইতেছিল।

মেজর মঞ্জিষ্ঠার মুখ পানে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন —"মঞ্জু, আজ আমার ঠিক এই তিরস্কারেরই দরকার ছিল। নিজের ভুল অনেক সময় মনের কাছে ধরা দিয়েছে, কিন্তু ঠিক এমনি ক'রে মুখের উপর কেউ কোনোদিন বল্‌তে পারে নি ব'লেই, পথ খুঁজে পাই নি। আবার বল দিদি, যে উর্ম্মিলা সাধ্বী ছিল। আমিও আজ সর্ব্বান্তঃকরণে বলছি, উর্ম্মিলা সতী। শুধু নিজের ভুলেই জীবনের এ বিপ্লব ঘটিয়ে তুলেছি, আজ তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি! নইলে, যমে-মানুষে আমার বডি-ওয়ারেণ্ট জারি ক'র্‌বে কেন?—এই আমার উপযুক্ত

শান্তি। জীবনের অবসান-প্রায় আলোক রেখাটুকুতেই আজ প্রায়শ্চিত্তের আগুন জ্বলে উঠেছে। এই ছাখ্—"

মেজর বালিশের নীচে হইতে ওয়ারেণ্টখানি কম্পিত হস্তে বাহির করিয়া মঞ্জিষ্ঠার হাতে দিলেন।

পরোয়ানার লেখা কয়টির উপর নজর পড়িতেই অনির পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল সে ভুল দেখিতেছে। নিজের অস্তিত্বের উপর অনির সন্দেহ হইল। সে যেন কোনমতেই নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। সজোরে চক্ষু দুইটি মার্জ্জনা করিয়া অনি মঞ্জিষ্ঠার হাত হইতে ওয়ারেণ্টখানি লইয়া প্রত্যেকটি অক্ষর মিলাইয়া পড়িয়া দেখিল। একি! এ যে সত্যই লেখা রহিয়াছে—

অরুণময় রায় চৌধুরী
পিতা স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র রায় চৌধুরী
—তোড়ণগ্রাম; বর্দ্ধমান।

অনির সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল—সে বুঝি পড়িয়া যাইতেছে। পৃথিবীর সব কিছুই যেন একটা ভূমিকম্পের দোলায় উল্টাইয়া পড়িতেছে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, নিজেকে সংযত করিয়া লইবার জন্য অনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল।

মেজর ও মঞ্জিষ্ঠা—উভয়েই বিহ্বল হইয়া অনির এই আকস্মিক অবস্থান্তরের পানে চাহিয়া রহিলেন। কেহই কিছু ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না।

মঞ্জিষ্ঠা তাড়াতাড়ি অনিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"অনি, অমন করছিস কেন, ভাই?"

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে অনি আর্ত্তের মত বলিয়া উঠিল—"ওগো দিদি, মিছে আর এ ওয়ারেণ্ট কেন? তিনি যে বহুদিন আগেই সকল ওয়ারেণ্টের বাইরে চলে' গেছেন। এ যে আমার স্বামীর নামের পরোয়ানা। ঐ যে আমার শ্বশুরের নাম লেখা রয়েছে,—সেই তোড়ণগাঁ—" অনির মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। তাহার ভিতরটা যেন অচেতন হইয়া আসিতেছিল।

"বালাই, ও কথা বল্‌ছিস্ কেন অনি? এ ওয়ারেণ্ট যে দাদার।"

অনি জোরে মঞ্জিষ্ঠাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"অ্যাঁ! তবে ব্রাউন সাহেব বাবার কাছে যে তার ক'রেছিলেন 'এ. এম্. রায় চৌধুরী, যুদ্ধে মারা গেছেন'; সে কি মিথ্যে?"

বুকজোড়া কান্নায় অনি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

বনবিহারীবাবু, নিরঞ্জন ও মঞ্জিষ্ঠা অবাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন।

মেজর হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—"ব্রাউন! ৫৯নং রেজিমেণ্টে আমাদেরই ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন ছিল। যে মারা গেছলো, সে—আনন্দমোহন—সিলেটের।

অনির মুখপানে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া সহসা আবেগভরে উঠিয়া বসিয়া মেজর চীৎকার করিয়া বলিলেন—"অনি, অনি,—তুমিই অন্নপূর্ণা?"

═══